২৩৮

সাক্ষরতা বুলেটিন

চৈত্র ১৪২০
মার্চ ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৩৮ চৈত্র ১৪২০ মার্চ ২০১৪

সূ চি প ত্র

৩ **শফি আহমেদ**
…আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি…

৯ **আলী কদর**
আমার স্ত্রী লুৎফুন নাহার হেলেন

১৪ **শাওয়াল খান**
আন্তর্জাতিক নারী দিবস: নারীর শক্তির উৎস

১৮ **কুমার প্রীতীশ বল**
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পাহাড়ের নেত্রী
কল্পনা চাকমা'র কথা

২০ **সারা জামান**
যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশ

২৩ **এ এম রাশিদুজ্জামান খান**
তবুও গেল না আঁধার

২৬ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

শ ফি আ হ মে দ

.....আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি.....

যে কোন দেশ, যে কোন জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় সঙ্গীত তার পরম সম্পদ। এই সঙ্গীতের সঙ্গে দেশ এবং জাতি হিসেবে কোন দেশের জনসাধারণের, সমগ্র জনগণের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরববোধ জড়িয়ে থাকে। এই বোধ ব্যক্তি হিসেবে একজন নাগরিককে আবেগকাতর করে তোলে, দেশ ও সমাজের সঙ্গে কোন ব্যক্তির আত্মিক মালিকানা তৈরি করে, আবার প্রায়শই তা সমবেত বা সম্মিলিত কণ্ঠে গাওয়া হয় বলে, এর মধ্যে সমষ্টির ঐক্যবোধ ও জোটবদ্ধতার একটা অনিবার্য আভাস সৃষ্টি হয়।

জাতীয় সঙ্গীত এমন এক গান যা সবাই, মানে সংশ্লিষ্ট দেশের সকল মানুষ, তা তাদের গলায় সুরধ্বনির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যেমনই হোক না কেন, গাইতে শিখে যায়, গাইতে পারে। অন্য কোথাও না হোক, খেলার মাঠে জাতীয় সঙ্গীতের একটা দৃশ্যমান ও শ্রবণমুখর এমনকি আবেগার্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় সঙ্গীত সত্যিই এক্ষেত্রে এক গভীর উদ্দীপক ভূমিকা পালন করে থাকে। খেলোয়াড়রা গাইতে থাকেন, ষ্টেডিয়ামে উপস্থিত সেই দেশের নাগরিকবৃন্দ পরম আবেগে তাতে গলা মেলান। সুর-তাল-লয়ের শুদ্ধতা তখন গৌণ হয়ে পড়ে। পরম দুর্নীতিবাজ যে ব্যবসায়ী জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করছে, সেও জাতীয় সঙ্গীতের সুরে আপ্লুত বোধ করে, খুনের অপরাধীও এই গানের মধ্যে দেশমাতৃকার জন্য ভালোবাসার কথা খুঁজে পায়।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এমন সরল ও আন্তরিক জবানবন্দীর কোন জাতীয় সঙ্গীত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। বাঙালি, বাংলাদেশের সকল নাগরিক, আমি এ দেশের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেই এই কথা বলতে চাইছি, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গিয়ে, গলা মেলাতে গিয়ে আমরা সবাই একটা গভীর আত্মপরিচয়ের সন্ধান যেন পেয়ে যাই।

দুঃখ এবং গ্লানির সঙ্গে স্মরণ করতে চাই, আমাদের প্রাণে বাঁশি বাজানো এই গানকে দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাতিল করতে উদ্যোগী ছিলেন অনেকে, যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ছিলেন। ঐতিহ্য, নিয়ম ও সরকারি নির্দেশনা থাকলেও একথাও সত্য যে, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আসক্ত, বেশ কিছু মাদ্রাসায় অদ্যাবধি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অনুভব এমন যে, এ এমন এক গান, যা একা একা গাইলেও আমরা প্রত্যেকে শিহরিত বোধ করি। গুনগুন করলেও আমাদের মনের মধ্যে বাংলাদেশের ছবিটা দারুণ মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার যখন সবাই মিলে গাই, কোন বিশাল অনুষ্ঠানের শুরুতে বা শেষে, তা ব্যক্তি থেকে সমষ্টির মধ্যে এক অনির্বচনীয় উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয়।

ছাব্বিশে মার্চ, এবারের স্বাধীনতা দিবসে 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' নামে প্রায় সমগ্র জাতির সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার এক মহোৎসব উদযাপিত হল। সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় এমন এক সুবিশাল এবং অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান নিয়ে তর্কবিতর্কটাও কম হয়নি। তার সবটাই যে অসঙ্গত অথবা যুক্তিবিবর্জিত, সেকথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না।

স্বাধীনতা দিবসে, তা-ও আবার যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য হরিদাসীর সিঁথির সিঁদূর মুছে গিয়েছিল, মসজিদের মিনারেও লেগেছিল পাকিস্তানী সেনার ছোঁড়া মার্কিন গুলি, বিসর্জন দিতে হয়েছিল লাখো লাখো জীবন, সেই স্বাধীনতা দিবসে সারা জাতি একসঙ্গে এক মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একটি বিশেষ ক্ষণে জাতীয় সঙ্গীত গাইবে, এর মধ্যে তো বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না। যাই হোক, ওই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু বা পরিসীমানা বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।

কিন্তু যে কারণে এই বিষয়টির অবতারণা, তার মধ্যে সাম্প্রতিকতা ও কাললগ্নের প্রশ্ন খানিকটা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। বলতে চাইছি, ২০১৪ সালের ২৬ মার্চ বেলা ১১টা বিশ মিনিটে যখন সবাই মিলে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গাইছি, তখন বিতর্কাতীতভাবে ওই গানটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত-অতিরিক্ত কোন মাত্রিকতা অর্জন করছে কি না, তখন তা ব্যক্তির গান, দেশের গান, দশের গান, মানুষের গান, বাঙালির গান হয়ে উঠছে কিনা। আবার অনেক মানুষ, হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে গাইলেই কি তা দশের গান হয়ে উঠবে, এমন একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও তো অর্থবহভাবে তোলাই যায়।

তা হলে আমাদের সামরিক বাহিনীর স্টেডিয়ামে যখন কোন জনপ্রিয় ব্যাণ্ড বাজিয়ে-গাইয়ে দল উচ্চকণ্ঠের উন্মাতাল শব্দ এবং দৃশ্যের প্রদর্শনী সৃষ্টি করে, আর উপস্থিত প্রায় সবাই যখন তার স্বরে সম্মিলিত দোহার যোগান দেয়, শুধু মানুষের সংখ্যা বিচার করে তাকে কি আমরা 'দশের গান' হিসেবে বিবেচনা করব? এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত জটিল নয় অথবা নাতিজটিলও হতে পারে। সেটা নির্ভর করবে গানের বাণীর অথবা ও গানের রচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতের ওপর। আবেগহীন ভালোবাসার কথাকে প্রায় ধমকের সুরে উচ্চারণ এবং অজস্র শব্দযন্ত্রের প্রক্ষেপণে তাকে সুতীব্র করে তোলার প্রয়াসে যে বিচিত্র শব্দবৈভব সৃষ্টি হয়, শব্দকে আলাদাভাবে শনাক্ত করতে না পারার তেমন আকাশবিদারী সাঙ্গীতিক পরিবেশনায় যেমন, ঠিকই একইভাবে '.....একদিন বাঙালি ছিলাম রে' গানের সঙ্গে আমি হাজারো তরুণ-তরুণীকে গলা মেলাতে দেখেছি, লোকনৃত্যের ভঙ্গিমায় নাচতে দেখেছি। তাই সমগ্র পরিবেশনা এবং উপলক্ষও একটা গভীর অর্থদ্যোতনার জন্ম দিতে পারে। তর্কটা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট গভীর অর্থবোধক বিতর্কটাও এই আলোচনার জন্য আপাতত অতটা প্রাসঙ্গিক নয়।

দেশ এবং দশ-এই শব্দযুগল এমন পরস্পরামগ্ন এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষায় তার স্বরশ্রুতি এতই ঘনিষ্ঠ যে, দশের এবং দেশের গান, (যা মূলত দেশাত্মবোধক গান) এই ভাবনার মধ্যে উভয়ের তাৎপর্যপূর্ণ সংস্থাপন এক গুরুত্ববহ ঐতিহাসিক সাংকেতিকতা সৃষ্টি করে, যদিও সাধারণ উচ্চারণে তা কতই না স্বাভাবিক মনে হতে পারে।

রোববার প্রভাতে সারা দুনিয়া জুড়ে খ্রিষ্টীয় চার্চে যে ধর্মগীতি গীত হয়, যাতেও মিলে যায় লাখো কণ্ঠ, হয়ত কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। কিন্তু লাখো মানুষের পরিবেশনায় এই রীতির গীতি ধর্মবিশ্বাসীদের কাছ থেকে যে অন্তর্গত নিবেদন আশা করে, তাতে তো তেমন ঘাটতি থাকে না। লাখো খ্রিষ্ট ধর্মবিশ্বাসী হয়ত বাইবেলের বিভিন্ন ধর্মগীতি (Psalm) গাইছেন, সেসবের বাণীতে শনাক্তযোগ্য পার্থক্যও হয়ত আছে। কিন্তু রোববারের প্রভাতবেলায় দুনিয়াব্যাপী খ্রিষ্টানদের অমন সম্মেলক সুরের মধ্যে তো ঈশ্বর অথবা যীশুর কাছে নিবেদনের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়, তার অতিরিক্ত ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, শিক্ষিত-নিরক্ষর এমন কোটি মানুষের একটা ঐক্য সূত্রের পরম বন্ধনও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে কি আমরা এমন রচনা বা উপস্থাপনাকে দশের গান বা মানুষের গান বলে প্রত্যয়ন করব?

আদিতে গান গাওয়ার বিষয়টা ছিল একান্ত ব্যক্তিক, পরম কোন মুহূর্তে, দুঃসহ বা অনিবার্য একাকীত্বে, যন্ত্রণার্ত বিচ্ছেদ-বেদনায় মানুষ তার হাহাকারকে ভাষা দিয়েছে সঙ্গীতের সুরে। বিবর্তনের নানা পথ পাড়ি দিয়ে, সভ্যতার অগ্রগমনের বিবিধ সাংঘর্ষিক বিন্দুতে গানের বাণী ও সুর, তার উৎপত্তি ও বিস্তার, তার অন্তর্গত জন্মভূমি এবং সুবিস্তৃত শ্রোতৃজগত সঙ্গীতের একক

ভুবনের সীমানাকে তছনছ করে তার মধ্যে যখন একটা সম্মেলক চরিত্র সৃষ্টি করল, তখন থেকেই গানের ব্যক্তিক সৃজন ছাড়াও সঙ্গীতের একটা ব্যাপকতর গণস্বত্ব তৈরি হল।

রচনা করেছেন বা সুর দিয়েছেন কোন একজনাই, কিন্তু গাইবার অধিকারকে বেশ জোরের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন অনেকেই। রচনাকারের ভাবনার মধ্যেকার আদি সত্যটা আর সুপ্ত থাকে না, সম্মিলিত পরিবেশনায় তার বিপুল ও অকপট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সহজেই স্মরণে চলে আসে, মহারণে সহিংসতার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হবেন একটু পরেই, কিন্তু তবু সুশৃঙ্খল সৈনিকদলের পদবিক্ষেপের ছন্দে ছন্দে বেজে উঠেছে স্বদেশভুবনের প্রতি দায়বদ্ধ শব্দসমাহার আর কণ্ঠে আত্মবিসর্জনের সাঙ্গীতিক ঘোষণা। এমন সুরসৃজন ও পরিবেশনাকে দশের না বলতে পারি, কিন্তু দেশের গান বলে তো স্বীকার করে নিতেই হবে।

তাত্ত্বিক এই অবস্থান থেকে যদি একটু সরে আসি। রবীন্দ্রনাথের বহু গানকেই প্রাথমিকভাবে দেশের গান বা দেশাত্মবোধক গান এবং তারপর তার সমবেত পরিবেশনার ভঙ্গিমায় দশের গান বলেই বিবেচনা করা যায়। তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের সব গান সম্বন্ধেই এমন একটা মন্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে।

কিন্তু এই নাতিগম্ভীর রচনার ভাবনাটা নিয়ে খেলতে খেলতেই মনে হল, রবীন্দ্রনাথ যখন ওই অসাধারণ এবং জনপ্রিয় গানটা রচনা করছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে', তখন তার ভাবনার চত্বরে কোন এক ব্যক্তির একক পথচলার বিষয়টি মুখ্য হয়ে ছিল না কি সমষ্টির? এবং কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে একক ভূমিকার সম্মিলিত চরিত্রের প্রতি কি আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন তিনি? এই গানটি রচনার কালগত, ভাবনাগত, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে এবং যাঁকে একাই পথ চলতে আহ্বান জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সেই মহামানব সম্পর্কেও আমাদের সকলেরই ধারণা আছে।

তিনি ওই ব্যক্তি বা নায়ককে একাই এগিয়ে যেতে বলছেন। আর বলছেন তো তিনি একক কণ্ঠেই। তবে জাতীয় বা বাহ্যিক প্রেক্ষাপট যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয় এবং ওই প্রেক্ষাপটে আছে সমষ্টির, প্রকৃতপক্ষে দেশের সমগ্র জনসংখ্যার বিপুল অবস্থান। তাঁর ডাক শুনে আরো অনেকের তো আসার কথা, আবশ্যিকভাবেই যোগ দেবার কথা। কিন্তু কবি বুঝতে পারছেন, মুক্তিসংগ্রামের শঙ্কার পথে পা বাড়াতে অনেকে ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। আবার খুব সহজেই বোঝা যায়, একলা যে পথে এগিয়ে যেতে হবে, তার গন্তব্যটা কিন্তু শুধুই কোন ব্যক্তি-অভিযাত্রীর নয়, বহুর, সমষ্টির। গানটি কোন একজন অন্তর দিয়ে গাইলেই ছুঁয়ে যায় আমাদের সবাইকে। নিশ্চিত জানি, সুচিত্রা মিত্রের অমন দীপ্তিময়ী ও হৃদয়প্লাবী কণ্ঠস্বরের রোমন্থন আমাদের মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই গানটির কথা লিখতে গিয়েই স্মৃতির ঘরটাতে টোকা দিচ্ছে, আমাদের কৈশোরকালের একটা জনপ্রিয় গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা-'রানার'।এটি একটি দীর্ঘ কবিতা, রাতের ডাকবাহক একাকী পথচলা এক ব্যক্তির কর্মগাথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রানার চরিত্রকে আমি কখনো দেখেনি, তবে কোন একটা ছায়াছবিতে দেখেছিলাম। ওই কবিতার গীতভাষ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এমন গভীরভাবে আবেগ প্রোথিত করেন যে, তা শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে যায়, রানারের জন্য সমব্যথী করে তোলে তাদের। এই গানের চরিত্রও কিন্তু একজন এবং আগে যে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা উল্লেখ করলাম, প্রকৃতপক্ষে তার প্রবল বিপরীতে এই রানারের অবস্থান। সাধারণভাবে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে আমরা জানি। একজন রানারের কথা বলতে গিয়ে তিনি এমন হাজারো শ্রমজীবী মানুষের জীবন-কথার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হেমন্তের কণ্ঠে রানারের কর্মগাথা স্বাভাবিকভাবেই 'দশের গান' হয়ে ওঠে।

আমার এমন মন্তব্যের সঙ্গে কারো দ্বিমত থাকলে আমি জোর গলায় তার প্রতিবাদ করব না। কারণ, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা দশের গান বলে আলাদা করে সঙ্গীতের একটা স্তম্ভ বানাতে চাইছি, তার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে একটা তত্ত্বগত পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার সায় নেই। কিন্তু অমন তত্ত্বের যৌক্তিকতাকেও আমি নাকচ করে দিতে চাই না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আর একটা পরিপ্রেক্ষিতজাত বিষয়ের বা সমাজচিত্রের অবতারণা করতে চাই।

আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ধীবর গোষ্ঠী সাগরে মাছ ধরতে যান। এই কাজের মধ্যে যে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা আছে, আমরা নাগরিক বৃত্তের মানুষজন তা হয়ত অনুধাবনও করতে পারব না। এই জেলেরা, এইসব জেলেনৌকার মাঝি-মাল্লাররা অত্যন্ত সনিষ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে নানা পীর, ঠাকুর, দরবেশ, জলের দেবদেবী এবং এমনকি আনুষ্ঠানিক ধর্মের নানা দেবদূত মায় আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবান প্রভৃতির প্রতি বন্দনাগীতি গাওয়ার পর যাত্রা শুরু করেন। আমাদের দেশের উদারনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটা যে শুধু শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর আলোচনাভোগ্য কোন বৃত্তাবদ্ধ বিষয় নয়, তা যে বাঙালি সমাজের অনাদি গঠনের অন্তর্ভুক্ত, এমন সব বন্দনাগীতি থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

তাত্ত্বিক দিক থেকে এক্ষেত্রে দু'টি উপাদানকে আলাদা করে শনাক্ত করা যায়। প্রথমত, আমরা যখন 'দশের' কথা বলি, তার দ্বারা 'আম' জনতা অথবা আর একটু স্পষ্ট করে বললে,

সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাইরের দরিদ্র, নিরক্ষর অধিকারহীন সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাই। তাদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের যে পার্থক্য তা তো থাকেই না, চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-বরিশাল ফরিদপুরী আঞ্চলিকতার বিভেদটাও থাকে না, শ্রমের পেশাজীবীতার মধ্যে যে বিভাজন অর্থাৎ বর্গাচাষী, ক্ষেতমজুর, ইটভাঙ্গা খাটুরে, ভাঙারি, কুলি, রিক্সাওয়ালা, ঝাড়ুদার এমনকি যৌনকর্মীর আলাদা শ্রমের এলাকার কোন বৈশিষ্ট্য আলাদা করে আমরা শনাক্ত করি না।

একারণে আমাদের দেশের ভাওইয়ার যে গান ও সুর গীত হয় গরুর গাড়ির চালকের কণ্ঠে, তা মন দিয়ে শুনলে প্রাথমিকভাবে অথচ গভীরভাবে মনে হতে পারে, কোন সুখহীন সম্পদহীন সঙ্গীহীন আলোহীন সম্ভাবনাহীন একজন মানুষ বুঝি তার হৃদয় নিঙড়ানো জীবনকথা সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে। গাড়িয়াল ভাই তো কোন শ্রোতার কথা ভেবে এই গান করছে না, এমনকি সে যে তার বেদনার কথা ঈশ্বরের কাছে পেশ করছে তাও তো নয়, অথবা তার অ-সুখ এবং অ-ভাবের কোন প্রতিকার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তো এর মধ্যে ফুটে ওঠে না। এ যেন তার গভীর স্বগতোক্তি। কিন্তু মনোযোগী বা সংবেদী শ্রোতার কাছে তার ওই ব্যক্তিক বা একান্ত পরিবেশনা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেখানে আর ব্যক্তিগত বেদনার কথাটা মুখ্য হয়ে ওঠে না, আমরা যেন এমন দরিদ্র এবং সম্বলহীন মানুষের গানের মধ্য দিয়ে তার মতো আরো অনেকের জীবনদর্শনের একটা পরশ পেয়ে যাই। একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যের ভৌগোলিক প্রকৃতিও হয়ত আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ওই গানে যে ব্যক্তিগত অতৃপ্তি ও হাহাকার আছে, তার অদৃশ্য শেকড়টা লুকিয়ে থাকে আমাদের বৈষম্যপ্রবণ সমাজকাঠামোর মধ্যে, তখনই একক গানের আত্মার মধ্যে সমষ্টির ভাবনা বা চৈতন্য প্রোথিত হয়ে যায় এবং আমার বিচারে তা তখন 'দশের গান'-এ অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে এক তাত্ত্বিক পরিণতি পায়। এ এক বিচিত্র ঊর্ধমুখী বিবর্তন।

মধ্যবিত্ত শিবিরের আব্বাসউদ্দীন যখন ওই গানে মজে ওঠেন, তখন সাধারণভাবে হয়ত তার সুরস্বাতন্ত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে ধূলিধূসর ধোঁয়াশাচ্ছন্ন একটা জনপদের ব্রাত্য সুরকে গলায় তুলে নিলেন এবং নাগরিক সমাজে সেটাকে জনপ্রিয় করে তোলবার প্রয়াস নিলেন, তার দ্বারা তিনি একটা অসাধারণ সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করলেন। অনেকটা হয়ত নিজের অজান্তেই। তিনি তখন আঞ্চলিক সুরকে, দশের গানকে দেশের গান-এ রূপান্তরিত করলেন, যদিও তার আদি রূপটার কোন হেরফের হল না।

এই সূত্রেই মনে পড়ছে, আমাদের কৈশোরের আর এক বহুলশ্রুত গান 'আল্লা মেঘ দে পানি দে, ছায়া দে রে তুই'। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালাকে যে 'তুই' বলে সম্বোধন করে কিছু নিবেদন বা আবদার নয়, জোর গলায় দাবি করা যায়, সেটা ওই বয়সে শুনে একটু থমকেও গিয়েছিলাম মনে আছে। সত্য কবুল করে বলি, প্রথমে একবার দু'বার যখন এই গান শুনেছিলাম আমার অপটু কিশোর রসবোধকে তা তৃপ্ত করতে পারেনি। গানের সমাজতত্ত্ব নিয়ে ভাবনার সূচনা তখনো হয়নি আমার করোটির ভেতর। যাই হোক, যতদূর মনে পড়ে, এই গানটাকে একটা পরিপ্রেক্ষিতের বসতির মধ্যে যখন আবিষ্কার করলাম, তখন তা আমাকে সবিশেষ তৃপ্তি দিয়েছিল। গণজাগরণকে মূর্ত করে তোলার অভিপ্রায়ে একটা গীতিনাট্যের মধ্যে এই গানটি সংস্থাপিত হয়েছিল; তা শুনে এবং দেখে আমি খুবই আপ্লুত বোধ করেছিলাম। পরিপ্রেক্ষিতটা সত্যিই রসবোধ বা রসসঞ্চারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান।

স্মৃতির তাড়না এই মুহূর্তে আমাকে বিচলিত করছে। এই লেখাটার প্রথম দিকেই কোটি বাঙালির কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হবার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় থেকেই দেশের নানা অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার একটা রীতি গড়ে উঠেছিল এবং অবশ্যই নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ খুব সচেতনভাবেই এই রীতিটাকে একটা প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। স্মৃতির মুকুরে আবশ্যিকভাবেই জাহিদুর রহিম বা বাবু ভাইয়ের মুখ ভেসে উঠছে। বাবু ভাই তখন নানা অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে এই গানটাকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এবং এই রীতিটা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গত কারণেই ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের গান বৃত্তের 'আমার সোনার বাংলা' অচিরেই সারা পূর্ব বঙ্গে দশের গানে রূপান্তরিত হয়েছিল। উল্লেখ করার মত একটা বিষয় হল, এই রূপান্তরের মাধ্যমে গানটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তগোষ্ঠীর পরিপোষণায় বিপুল গণভিত্তি ও গণশ্রুতি অর্জন করলেও এই গানের আদিতে তো রয়েছে বাংলার প্রান্তদেশের লোকজ বাউল সুর।

কিন্তু 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'-র সূত্রে আমার অন্য একটা গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। উনিশ শ' একাত্তর সাল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শেষ হত রাত সাড়ে নয়টায়। নিয়ম মেনে সবশেষে জাতীয় সঙ্গীতের পরিবেশনা। অনেক অনেক বার এমনটাই ঘটেছে যে, ঠিক যে সময় রাতের খাবার গ্রহণ করছি বা শুরু করব বলে মেঝেতে আসন পেতে বসেছি, তখনই রাত সাড়ে নয়টা বাজতো, বেতার তরঙ্গে 'আমার সোনার বাংলা' বাজতো। খাদ্য গ্রহণ করতে পারতাম না স্বাভাবিকভাবে, কোন একবারও অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি, চোখের নোনা জল মিশে গেছে বাসনের সাদা ভাতের স্থাপত্যে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, আমাদের প্রাণের গান, আমাদের 'দেশের গান', কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে সে কোন এক চঞ্চল তরুণকে অশ্রুস্নাত করে

কিভাবে আর্দ্র করে দিত, সে এক গভীর ব্যক্তিক অনুভবের মন্ময় নিঃশর্ত অনুরাগঋদ্ধ প্রকাশ আবার রক্তাপ্লুত দেশমাতৃকার প্রতি অন্তরতর আনুগত্য, যা আজ আমার এই বার্ধক্যেও আমাকে একই মাত্রায় বিচলিত করে।

কিন্তু আবার একথা বলতে প্রলুব্ধ বোধ করি যে, ওই সময়, একাত্তরের ওই দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি শুধু এই সব বিশেষণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তারও আরো অনেক অর্থ ছিল, বেদনায়, সংবেদনায়, অভিজ্ঞতার ভাঙাগড়ায়। ঊনসত্তর থেকে একাত্তর, এই দু'বছরের ব্যবধানে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'-এই গানের আবেদনের যে যুগপৎ এমন হৃদয় তোলপাড় করা এবং রাষ্ট্রনৈতিকভাবে তাৎপর্যবহ বিবর্তন ঘটবে, সে কী আমরা জানতাম ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়কালেও?

সবাই জানি, এই গান রচনারও একটা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। আজি হতে শতবর্ষেরও আগে বাংলার বুক চিরে সেদিন ছিল না আজকের মত কাঁটাতারের বেড়া। তবে বাংলাকে ভাঙার একটা রাষ্ট্রীয় নির্ঘোষ উচ্চারিত হয়েছিল। তার মধ্যে অপ্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা তাদের (অপ)শাসনের স্বার্থে বাংলাকে খণ্ডিত করতে চেয়েছিল। সেকালের রাজনীতিকবৃন্দ তেমন প্রবলভাবে মুখর হয়ে ওঠেননি, যতটা তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর অসন্তোষ ও অননুমোদন। প্রতিরোধে সোচ্চার হবার জন্য আহবান জানালেন তিনি, মহাকবি নেমে এলেন রাজপথে, রাখীবন্ধনে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে মেলানোর প্রচেষ্টা নিলেন। লিখলেন অমর সব গান, যেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে *গীতবিতান*-এর স্বদেশ পর্যায়ে। বাংলার মাটি, 'বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি' এমন কত সব অসামান্য গান রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশ-গান, দেশের গান, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতি নামে যে একটা সঙ্গীত ও সুরের স্বতন্ত্র ধারা আমরা চিহ্নিত করি, তারও একটা মূর্ত রূপ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

দেশকে বন্দনা করে বা মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার টানে গান রচনার একটা ধারা অবশ্য এদেশে বহমান ছিল, উপনিবেশিক শাসন তাতে শুধু প্রাবল্য ও গতিশীলতা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন লেখেন 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা.....সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' বা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' তখন তিনি এই ধারাকেই পরিপুষ্ট করেন। আবার উল্লিখিত এই দু'টি দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বাণী ও সুরারোপ যদি বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখতে পাব, প্রথমটির মধ্যে যে সুখময় আবেগ এবং রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস আছে, দ্বিতীয় গানটি তা থেকে আলাদা। বঙ্গমাতার নানারকম দুঃখ-ক্লেশের উল্লেখ আছে, আর সেজন্য বঙ্গজননীর সন্তানদের প্রতি একটা তীব্র আহবান আছে, মাতাকে এই ধূসরতা, এই গ্লানি, এই নিগ্রহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য সম্মিলিত একটা উদ্যোগের ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। তাই প্রথমটিকে যদি মূলত 'দেশের গান' বলে তালিকাভুক্ত করি, দ্বিতীয়টির মধ্যে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য থাকলেও এখানে উদ্দীষ্ট একটা বঙ্গঅধিবাসীগোষ্ঠীর প্রতি আলোড়নপ্রদায়ী সুস্পষ্ট আহবান আছে, যা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' শীর্ষক সুদীর্ঘ গীতি/কবিতাকে 'দশের গানে' রূপান্তরিত করেছে। এই গানের সুরারোপের মধ্যেও সতেজ ও সপ্রাণ যে প্রবল উচ্চারণ আছে, তা এটাকে যতটা না মৃত্তিকাসংলগ্ন করেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি জোর পড়েছে মানুষের প্রতি, বাংলার জনমানুষের প্রতি। বঙ্গমাতার ধূসরতা বা রুক্ষতার জন্য যে তার সন্তানরাই দায়ী, সেকথাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখ করেছি, প্রায় অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'। কোন পাঠক বা শ্রোতা যদি এই গানটি রচনার ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত না-ও থাকেন, তিনিও কিন্তু অনায়াসে বুঝতে পারবেন কী ভয়াবহ তরঙ্গের আবর্ত অতিক্রম করে নৌকাকে কূলে ভিড়াতে হবে, সেজন্য মাঝি বা কাণ্ডারীর আন্তরিকতা, দক্ষতা এবং পারদর্শিতার কোন বিকল্প নেই। কী অসাধারণভাবে চিত্রটা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, 'দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে

মাঝি পথ।' এই সংকট গভীরতর হয়ে উঠেছে, দেশবাসীর মধ্যে সন্দেহ, সংশয়, ঈর্ষা, বিভেদ ও বিভক্তিতে। শুধু যেন কাজী নজরুল ইসলামই শব্দের চাবুক হেনে বলতে পারেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী, বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'। দেশের ও দশের গান কীভাবে অন্বিত ও অবিভাজ্য হয়ে ওঠে, তার এক ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত যেন নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। দু'টি পৃথক ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম উচ্চারণের মাধ্যমে কবি যেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এক আগ্নেয় সতর্ক বার্তা পাঠাতে চাইছেন। সবাই তো জানি, কৃষ্ণনগরে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রচিত এই মহান দেশ-গানটি সেদিন হাজারো কণ্ঠে গীত হয়েছিল।

অবশ্যই গানের বাণী, তার সুরারোপ ও পরিবেশনাই দেশের গানের, দশের গানের উৎকর্ষ এবং প্রভাব নির্ধারণ করে থাকে। নজরুলের মত গোত্র, পরিবার ও সমাজ থেকে নিজেকে অনন্য মানবিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ করার উদাহরণ তেমন বেশি পাওয়া যাবে না। তিনি সত্যিই অনন্য। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে যে গানটি বাংলায় অথবা বাংলা ভাষায় রচিত হলেও সারা ভারতবর্ষেই প্রবলভাবে প্রভাব ফেলেছিল, সেটি হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম'। ওপরে যে তিনজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের পংক্তি থেকে অনেকটা আলাদা, তাঁদের মত বঙ্কিমচন্দ্র কবি ছিলেন না। ব্রিটিশ সরকারের অনুগত কর্মকর্তা হিসেবে প্রান্তিক বিচারে পরোক্ষভাবে শাসকবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। তার উদাহরণ যেমনভাবে মিলবে তাঁর উপন্যাসের পাতায় এবং অন্যান্য রচনায়, তেমনি এই একটি দেশ-গানে।

একটু আগেই সম্প্রদায় বিভাগের কথা বলেছি। ইতিহাস বলে, বঙ্কিমের এই 'বন্দে মাতরম' কিছুটা হলেও ওই বিভাজনে ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু 'বন্দে মাতরম' শব্দযুগলের মধ্যে মাতৃবন্দনার যে আদি ভারতীয় বা স্তোত্রপ্রতিম শব্দচয়ন এবং আবহ ছিল তা একদিকে যেমন সনাতন সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে, তেমনি অন্য সম্প্রদায়কে কিছুটা নিরুৎসাহিত করেছিল।

'বন্দে মাতরম'-এর তুল্য সেকালের আর একটি দেশ-গান পরাধীন ভারতবর্ষে অভিজাত মধ্যবিত্ত এবং জনতার মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেটি অবশ্য উর্দুতে লেখা। ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা এ হিন্দুস্তান হামারা' গানটির অসামান্য জনপ্রিয়তা ছিল ভারতবর্ষব্যাপী। যে ভারতের চিত্র আঁকা হয়েছে ইকবালের এই গানে, তার সঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয় ও আত্মিক বোধ জাগরণের গভীর একটা ইতিবাচক এবং ঐতিহাসিক যোগ ছিল। এখানে যা পুনর্বার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তা হল, এমন দেশ-গানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে বিদেশী শাসনের বিরোধিতায় এবং এই ধারার উদগাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিল উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

কিন্তু দশের গানের সঙ্গে যেখানে দেশের গানের অমন বন্দনাপ্রবণ বা উচ্ছ্বাসপ্রবণ প্রকাশের যোগ ঘটেছে, তার বাইরে আরও অনেক শতক আগে থেকেও তো মানুষ গান গেয়েছে, এবং তার সবটাই যে একান্তে গাওয়া হত ব্যক্তিক অনুভব প্রকাশের জন্য তা তো নয়। বাংলাদেশে এখনো এদিক সেদিক নৌকা বাইচের সংস্কৃতি টিকে আছে। দু'পক্ষ যখন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ, তখন দেখা যায় তারা শারীরিক কসরৎ এবং দলগত শক্তি বিনিয়োগের জন্য নিজেদের কণ্ঠে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার উদ্যমে শাক্ত সুর সৃজন করছে। কায়িক পরিশ্রমের কষ্টকে ভুলে থাকার জন্য দশে মিলে করি কাজের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে গান গাওয়ার রীতি সব সমাজেই প্রচলিত ছিল। লোহা আর কনক্রিটের এই যুগে অবশ্য আমাদের মত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের স্মৃতিভাণ্ডার ছাড়া অন্যত্র চুন-সুরকির ছাদ ঢালাই দেবার সময় যে সম্মেলক গান গাইবার রীতি ছিল এই বাংলাদেশে, তার কোন সন্ধান এখন আর পাওয়া যাবে না।

এখনো অবশ্য শ্রমনিবিড় কাজে 'হেই সামালো হেঁইয়ো, জোরসে মারো হেঁইয়ো' ধরনের গান হয়ত শোনা যায়। শ্রমের মূল্য এবং শোষণ উভয়কেই প্রকাশ করার জন্য গণসংগীতের গায়কদল এই সেদিনও এসব গান ফেরি করে বেড়াত, রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক শাখা এর সম্প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিল। বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনে দশের গান প্রসঙ্গে রাজনীতি, বিশেষত বামপন্থার রাজনীতির বিকাশ ও জনপ্রিয়তার একটা ঐতিহাসিক যোগ আছে।

১৯১৭ সালে বলশেভিক আন্দোলনের সফল পরিণতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশগুলিতে বিপুল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দশের গানের সঙ্গে এই তাত্ত্বিক রাজনীতির যোগ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার ব্যাপক প্রভাবে দশের গান যে ক্রমেই গণসংগীত নামে একটা আলাদা সংজ্ঞায়নে চিহ্নিত হতে লাগল, তার রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বুঝতে কষ্ট হয় না এবং উত্তরকালে সাধারণ জনতার গানে এই ধারার সর্বাত্মক প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যায় এবং শোষণের প্রতিবাদী অস্ত্র হয়ে ওঠে গণসংগীত, দেশের গান সম্মিলিত কণ্ঠে মুক্তির গান হয়ে ওঠে।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আ লী ক দ র

আমার স্ত্রী লুৎফুন নাহার হেলেন

ঊনিশ শ' একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। স্মৃতির পথ হেঁটে ওই সময়ের বিন্দুতে পৌঁছে গেলে প্রাথমিকভাবে চোখে যা ভেসে ওঠে তা হল স্বজনের রক্তাক্ত দেহ। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হারিয়ে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন। শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সৈনিকদের যেমন আমরা হারিয়েছি, তেমনি জীবনদান করেছেন লাখো সাধারণ মানুষ। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *স্মৃতি: ১৯৭১* নামে একটি সিরিজে সাধারণ মানুষকে হারানো স্বজনদের স্মৃতিভাষ্য সংকলিত হয়েছে। ওই গ্রন্থমালার অষ্টম খণ্ড থেকে একটি অংশ এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হল। একজন ব্যক্তি এই অংশবিশেষ পাঠের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে আমাদের দেশের একটি এলাকার একটি মূর্ত চিত্রের সন্ধান পাবেন। শহীদ স্ত্রী সম্পর্কে লিখছেন তাঁর স্বামী। দু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা, এক সুখী শিক্ষক দম্পতি, যারা বামপন্থায় বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি চাইতেন। সেই প্রেরণায়ই যোগ দিয়েছিলেন, সংগঠিত করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। এই রচনার শহীদ নারীকে যেভাবে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, হত্যা ও অপমান করা হয়েছে এবং সেই নারী তার আগে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডে যে ধরনের সাংগঠনিক ভূমিকা রেখেছেন, তাঁর স্বামীর জবানিতে তা এমন বর্ণনা ও স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যের অংশ হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী নেতার অকাতর জীবনদান ও বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে পরিচালিত ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ফলে আমাদের অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ এক মহান ও গৌরবময় ইতিহাস। জাতির এই গৌরবময় ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে যাঁরা নিজেদের নাম লিখেছেন এমন ধরনের বাংলা মায়ের বীর সন্তানদের এক বীর সন্তান তথা এক বীর নারীর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনীর আলোকপাত ও স্মৃতিচারণই আমার এ –লেখার বিষয়। বাংলা মায়ের এই বীর সন্তান –শহীদ লুৎফুন নাহার হেলেন।

মাগুরা জেলা শহরের সর্বজনপরিচিত এক গণ্যমাণ্য ব্যক্তি মো. ফজলুল হক সাহেবের ৫ পুত্র ও ৯ কন্যার ৬ষ্ঠ কন্যা ছিল লুৎফুন নাহার হেলেন। ১৯৪৭ সালে মাগুরা শহরে তাঁর জন্ম। তার ফুটফুটে সুন্দর চেহারা দেখে তার আব্বা আদর করে তাঁর নাম রেখেছিলেন হেলেন। হেলেন নামের পাশাপাশি তাকে হেলেনা নামেও ডাকা হতো। আর লুৎফুন নাহার নাম হয়েছিল সর্বপ্রথম তার স্কুলে ভর্তির সময়।

ছোটকাল থেকেই হেলেন ছিল একটু ব্যতিক্রমী ধর্মী। উচ্চশিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে একজন খ্যাতনামা মহিলা হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। আর সেই কারণেই ছোটকাল থেকে সে পড়াশুনায় ছিল মনোযোগী; কাজে, কথাবার্তা ও চলাফেরায় ছিল পরিচ্ছন্ন ও নিয়মমাফিক এবং চরিত্রের দিক দিয়ে ছিল সৎ ও সংযমী। অনেক ভাইবোনের মাঝে থেকেও সে তার পড়াশুনা ঠিকমতো চালিয়ে যেতো। স্কুল জীবনে ক্লাশে ১ম হবার গৌরব ছিল তার প্রতি বছর।

হেলেনের আব্বা ছিলেন একজন ন্যায়বান, সত্যনিষ্ঠ, সৎ সাহসী ও যুক্তিবাদী মানুষ। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বইপত্রের একাগ্রচিত্ত পাঠক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী এক বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন যে, তাঁর মাথায় যত চুল আছে প্রায় তত বই তিনি পড়েছেন বলে তাঁর বিশ্বাস। হেলেন তার আব্বার বই পড়ার স্বভাব পেয়েছিল পুরোপুরি। ক্লাশের বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে তাঁর জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটে।

হেলেনের আব্বা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে প্রায় সবাই রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তার আব্বা মো. ফজলুল হক সাহেব তাঁর রাজনৈতিক জীবনে মাগুরার ন্যাপ ও কৃষক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ন্যাপ ও কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় বা ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ মাগুরায় গেলে মূলত তার বাড়িতে অবস্থান করতেন।

আমার আব্বা মো. আবদুল মালেক সাহেব ছিলেন ফজলুল হক সাহেবের আপন বড় ভাই। তিনি মাগুরা এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম উচ্চশিক্ষিত দুই-একজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে বি. এ. বি. এল ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া ইতিহাস, ধর্ম, আইন ও দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ছিলে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য।

রাজনীতিবিদ না হলেও রাজনৈতিক মনোভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক। তাঁর মৃত্যুর ৩ মাস পূর্বে অশীতিপর বৃদ্ধ অবস্থায় আইয়ুব খান ঘোষিত সামরিক আইন জারির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন– সামরিক আইন হলো এক জংলী আইন। সভ্যসমাজ তা কখনোই স্বেচ্ছায় মেনে নিতে পারে না।

আমার বড় ভাই আলী করিম সাহেব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে সেখানকার ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরে তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক হন এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে Ministry of Finance-এ Section officer-এর দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সেখান থেকে গোপনে বাংলাদেশে এসে পরে ভারতে গিয়ে স্বাধীন বাংলা প্রবাসী সরকারের উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার পদের যোগদানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মো. ফজলুল হক সাহেবের পরিচয় তথা আমাদের গোটা পরিবারের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতি সমর্থনে তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে হেলেন এদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ শুরু করে তার স্কুল জীবন থেকেই। স্কুলের ছাত্রজীবন থেকেই ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও স্বৈরাচার আইয়ুব সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ফেস্টুন হাতে মিছিলের প্রথম সারিতে থেকে সে শ্লোগানমুখর হবার অভ্যাস অর্জন করে। মাগুরা কলেজে অধ্যয়নকালে সে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় চলে আসে। নিজের যোগ্যতাবলে হেলেন মাগুরা কলেজ ছাত্র সংসদের মহিলা শাখার সম্পাদিকা নির্বাচিত হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, মাগুরা মহকুমা শাখার সহ-সভানেত্রীর ভূমিকায় থেকে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়।

পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির উপর যে জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, হেলেন যখন সবেমাত্র বি এ ক্লাশের ছাত্রী, এমন এক বয়সকালেই তার মাঝে উন্নত মানের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তার এরূপ উন্নত মানের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রমাণ মেলে তার ঐ সময়কার নিজ ডায়েরিতে লেখা এক বক্তব্য থেকে। যেমন, ১৯৬৭ সালে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেলে হেলেন মনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া লিখে রাখে তার ডায়েরির পাতায়। আমি তার ডায়েরিতে লেখা কিছু কিছু কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"২৪ শে আষাঢ়, ১৩৭৪ সাল।

সরকারের এক বিশেষ নির্দেশে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। বাঙালির ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য আবার সরকারি মহল তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের এ ধরনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাপঞ্জিকে।... আজ এরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদ দিচ্ছে, কাল এরা বলবে

রবীন্দ্রসাহিত্যই মুসলিম 'ঐতিহ্যের' (?) অনুকূলে নয়। এদের এই বহুল ব্যবহৃত 'মুসলিম ঐতিহ্যের' দোহাই দিয়ে এরা আরো কত কি যে করবে তা 'খোদাই মালুম' না বলে বলতে হয় মুজিবই মালুম।... হঠাৎ স্বাধীনতা লাভের ২০ বছর পর মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি।... রবীন্দ্রনাথ ত শুধু পশ্চিম বাঙলার কবি নন। তিনি বাঙালির কবি।... তিনি বিশ্বকবি।

তাই সরকারের এ ধরনের আইন জারিকে আমরা তাদের অজ্ঞতা বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। এটা সম্পূর্ণরূপে বাঙালিকে খাটো করবার প্রচেষ্টা– বাঙালির অধিকারকে পদদলিত, বাঙালির ঐতিহ্যকে পদদলিত করার প্রচেষ্টা ... ... আমরা জাতিগত দিক দিয়ে বাঙালি, আমরা বাঙলা ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। আমাদের সে ঐতিহ্যকে আমরা বুকের রক্ত দিয়ে টিকিয়ে রাখব– যেমন করেছিলাম ২১শে ফেব্রুয়ারিতে।..... ।"

হেলেনার সংগ্রামী জীবনের ধারাকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারায় বিকশিত করার ক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এদের হচ্ছেন তার আপন বড় ভাই মো. মাহফুজুল হক নিরো এবং অন্যজন, আমি।

আমি ও নিরো ভাই উভয়ই এদেশের শোষিত বঞ্চিত গরিব মেহনতি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে ১৯৬২ সাল থেকে মাগুরা ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃস্থানীয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে থাকি। আর এই সময় হেলেন আমাদের সাহচর্যে এসে আমাদের বিপ্লবী ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং কম্যুনিস্ট রাজনীতিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক বইপত্র পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেকে উন্নত মানের রাজনৈতিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরিপুষ্ট করে।

আমার ও হেলেনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ভিত্তিতে এক পর্যায়ে আমরা একে অপরকে আরো আপন করে পাওয়ার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার কারণে ১৯৬৫ সালের মে মাসের তার সাথে আমার বিয়ে হয়। আমরা উভয়েই রাজনৈতিক আর্দশগতভাবে সমমনা ছিলাম বলে আমরা ছিলাম দৃষ্টান্তমূলক এক সুখী দম্পতি।

সাংসারিক ঘরকন্নার কাজে হেলেন ছিল পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন এক দক্ষ গৃহবধূ। ওর হাতের তৈরি খাবার খেয়ে সবাই তাকে প্রচুর প্রশংসা করত। ঘরকন্নার পরিপাটি গোছালো কাজ ও বহুমুখী রান্নার কাজ সে শিখেছিল অসীম ধৈর্যশীলা, স্বল্পভাষী বুদ্ধিমতী ও নিরলস কর্মপ্রিয় স্নেহময়ী জননী মোছাঃ সফুরা খাতুনের কাছ

থেকে। পোশাক তৈরি ও সেলাই কাজে অসাধারণ দক্ষ ছিল হেলেন। স্কুল জীবনে, এমনকি পরেও সে নিজ পোশাকাদিসহ তার নিজ ছোট বোনদের পোশাক যেমন, ফ্রক, পাজামা, ব্লাউজ ইত্যাদি নিজেই মেশিন চালিয়ে তৈরি করত। ওর হাতের তৈরি পাজামা পাঞ্জাবী পরে ১৯৬৬ সালে আমি যোগদান করেছিলাম যশোর জেলা কৃষক সম্মেলনে। আর তা দেখে আমার অনেক বন্ধু আমাকে সার্থক ও ভাগ্যবান স্বামী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

১৯৬৫ সালে আমি ও নিরো ভাই (মো. মাহফুজুল হক) ছাত্রজীবন শেষ করে ছাত্র রাজনীতির বদলে পুরোপুরি জাতীয় রাজনীতিতে চলে আসি। অন্যদিকে হেলেন ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ছাত্রজীবন চলাকালে ছাত্র রাজনীতিতে তার প্রধান ভূমিকা রেখে তার পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। আমাদের পিতা ও পূর্বপুরুষদের আদি বসত-বাড়ি হলো মাগুরার অন্তর্গত মহম্মদপুর থানাধীন হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে। হেলেন তার ছাত্রজীবনেও মাঝে মাঝে হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তথাকার ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করত এবং আমাদের কর্মীদের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমার অবর্তমানে সে নিজে হয়ে যেত যোগাযোগের মাধ্যম।

সকল শোষিত বঞ্চিত মেহনতি সর্বহারা মানুষের মুক্তির জন্য যে লড়াই চলছিল সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ ও তাতে প্রয়োজনে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য হেলেন ছাত্রজীবন থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল এবং একথা সে তার নিজ ডায়েরিতে উল্লেখ করে। তার ডায়েরিতে আছেঃ

"৫ই আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৭৪ সাল– রাত্রিকাল।

–পুরানো প্রতিজ্ঞাটিকে নতুন করে ঝালাই করছি। সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের এই পটভূমিকায় সক্রিয় অংশ নিতেই হবে। প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ বিপ্লব করতে হবে।... ... স্বার্থ সবর্স্ব জীবনের প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় আত্মসুখ নেই। আমি সুস্থ মস্তিষ্কে অনেক ভেবেছি– আত্মকেন্দ্রিক প্রাচুর্যময় জীবনকে গ্রহণ করার মতো কোনো দুর্বলতাকেই আমি আমার মনের আনাচে-কানাচে হাতড়েও পাইনে।"

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমি মাগুরার শালিখা থানাধীন পুলুম হাইস্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক কাজ চালিয়েছি। এর পর আমি আমার গ্রামের বাড়ির সন্নিকটে অবস্থিত আমার নিজ থানাধীন ঝামা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে থেকে শিক্ষকতার কাজ ও তার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি। অন্যদিকে হেলেন ১৯৬৮ সালে বি. এ. পাশের পর মাগুরা গার্লস হাইস্কুলে (বর্তমানে সরকারি গার্লস হাইস্কুল) সহকারী শিক্ষিকার পদে যোগদান করে। সে ছিল অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ব সচেতন শিক্ষিকা। যার ফলে মাগুরা শহর ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে সে ছিল একজন নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

১৯৬৯ সালের প্রথম দিক ছিল আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের খুব ব্যস্ততার সময়। দেশব্যাপী গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের তখন সব আন্দোলনের শীর্ষে। ঐ সময় ১১ দফা আন্দোলনে জড়িত ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ দানে হেলেনের ছিল এক শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা। এছাড়া ১১ দফা আন্দোলনে মাগুরার ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য বজলুল করিম রাখুকে সংগ্রামের সংকটময় মুর্হূতগুলোতে সময়োপযোগী পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে তাদের কর্মসূচিকে সফল করতে সাহায্য করেছে সে। অন্যান্য ছোট ভাইবোনকে হেলেন পড়াশুনার সাহায্য ছাড়াও তাদেরকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে। ওর আরেক ছোট ভাই জাহাঙ্গীর কবির দাদু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিল স্কুলছাত্র এবং সে কৈশোরে ছিল বড়ই দুরন্ত। দুরন্ত দাদুকে তার আব্বা ও তার বড় ভাই নিরো সাহেবও নিয়ন্ত্রণে আনাতে পারতেন না। কিন্তু হেলেন তার স্নেহময়ী যাদুর স্পর্শে ওকে করে তুলত নম্র ও শিষ্ট। রাজনৈতিক কাজের মধ্যে পোস্টারিং করা, চিকা মারা, চিঠিপত্র বিলি প্রভৃতি ব্যাপারে সে তার দুরন্ত ছোট ভাই দাদুকে ব্যবহার করেছে সুবোধ বালকের মতো।

যুদ্ধের প্রথম ভাগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কিছুদিন পাকহানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ পরিচালিত হবার পর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে পাক সামরিক বাহিনী দেশের বড় বড় শহরগুলোতে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিগুলোতে অবস্থান গ্রহণ করে বাংলার স্বাধীনতার শত্রু জামাত ও মুসলিম লীগের মধ্যেকার দালালদের সাহায্যে গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ গ্রাম ও শহরের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে সারাদেশে শুধু ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাতে থাকে।

আমরা যারা তখন কম্যুনিস্ট পার্টির যশোর জেলা শাখার সঙ্গে জড়িত তারা তৎকালীন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তাই তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ও উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সময়োপযোগী কর্মসূচির অভাবে যশোর জেলার সকল কম্যুনিস্ট ও সকল বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাকহানাদার বাহিনী ও দালালদের পরিচালিত রাজাকার আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার কর্মসূচি গ্রহণ করি। নড়াইল শহরে অস্ত্রাগার দখল, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে সকল বন্দিদের মুক্তি দান ও ছোট ছোট প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের বাহিনীর

শক্তি বেড়ে উঠতে থাকে। ইতোমধ্যে যে সমস্ত বাঙালি পুলিশ ও সৈনিক যুদ্ধের ভিতর দিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল তারা অনেকেই আমাদের বাহিনীতে যোগদান করে আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

যশোর জেলায় আমাদের বাহিনীর মূল ঘাঁটি ছিল তৎকালীন মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত শালিখা থানাধীন পুলুম এলাকায় এবং আমাদের তৎকালীন যশোর জেলার মূল নেতা ছিলেন শেখ শামছুর রহমান। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ভারত সরকারের সাহায্যপুষ্ট হয়ে তখন যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠছিল তাদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ছিল যে, আমরা দেশের জনগণের সাহায্যে ও তাদের উপর নির্ভর করেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবো। তবে আমরা ভারত থেকে আগত মুক্তিবাহিনীর সাথে সামরিক সংঘর্ষে যাবো না। বরং তাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবো।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত হেলেন কখনও মাগুরা শহরে তার পিতার বাড়িতে থাকত, আবার কখনও থাকত আমাদের গ্রামের বাড়িতে। এর মধ্যে একসময় মাগুরার রাজাকার আলবদরদের নেতৃত্বে ছিল জামায়াতে ইসলামী দলের ঘাতক খুনীচক্র। তারা পাকবাহিনীর সমন্বয়ে মো. ফজলুল হক সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে হেলেনের বড় ভাই মাহফুজুল হক সাহেব ও তার অন্যান্য ভাইদের হত্যার উদ্দেশ্যে। ভাগ্যবশত তার ভাইয়েরা অন্য লোকের সাহায্যে দ্রুত আত্মগোপনের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করে।

ঐ রকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় হেলেন মাগুরা শহরে থেকেছে আমাদের দু'বছরের পুত্রসন্তান লুৎফে আলী দিলীরকে নিয়ে। মাগুরা শহর থেকে তার কাজ ছিল শহরে রাজাকার ও পাকবাহিনীর ভূমিকা ও তাদের কর্মসূচির সংবাদ জেনে তা আমাদের কাছে পাঠানো। হেলেনের ভাইদের ধরতে না পেরে টহল দিতে এসে একদিন কয়েকজন রাজাকার তার বৃদ্ধ আব্বাকেও ধরে নিয়ে যায় চোখ বাঁধা অবস্থায়। পরে নাকি অতি অক্ষম বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে ছেড়ে দেয় বেশ কিছু টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে। হেলেনের ছোট ভাই জাহাঙ্গীর কবির দাদুকেও একদিন রাজাকাররা দিনের বেলায় ধরে নিয়ে যায় এবং চরম শারীরিক নির্যাতন করে পিছন দিয়ে তার দু'হাত বেঁধে মাগুরা ডাকবাংলোর চার দেয়ালের মধ্যে ফেলে রাখে। ওদের পরিকল্পনা ছিল রাতের বেলা ওকে খুন করে ফেলে দেবে নদীতে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত দাদু প্রাক-সন্ধ্যাকালেই অদ্ভুত কৌশলে তার বাঁধন খুলে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করে।

এর মধ্যে আমরা আমাদের বাহিনীর সাহায্যে মাগুরার অন্তর্গত মহম্মদপুর থানা সদরে অবস্থিত রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং বহুসংখ্যক রাজাকার খতম করি। এর পরপরই আমরা থানা আক্রমণ ও দখল করে তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে সক্ষম হই। মহম্মদপুর থানা দখলের পর ঐ থানা এলাকাটি একটি মুক্ত এলাকারূপে প্রতিভাত হয় এবং মহম্মদপুরের দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বাহিনীর জন্যে একটি ঘাঁটি তৈরি হয় উপযুক্ত ট্রেনিং প্রদানের জন্য।

এই সময় আমাদের কাজের চাপ বেড়ে যায় কেননা ধীরে ধীরে তখন আমাদের বাহিনী বেশ বড় হয়ে উঠেছে। অতঃপর হেলেন চলে আসে মাগুরা শহর ছেড়ে মহম্মদপুর এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য। আমাদের একমাত্র পুত্রসন্তান দিলীর তখনও তার সাথে ছিল। মাগুরা ছেড়ে আসার সময় ওর আব্বা বলেছিলেন, "ছেলে রেখে যাও"। কিন্তু হেলেন তাতে রাজি হয় নি। মহম্মদপুর এলাকার আসার পর মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে হেলেনের কাজের ভার ছিল– মেয়েদের বিশেষত ভূমিহীন গরিব কৃষক পরিবারের মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা; যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের ধরন ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা; আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বইপত্র রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বাহিনী কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া, দেখাশুনা ও অসুস্থদের সেবাযত্নে সাহায্য– সহযোগিতা করা।

আমরা মহম্মদপুর থানা দখল ও সেখানকার রাজাকার ক্যাম্প সমূলে ধ্বংস করায় তৎকালীন সমগ্র যশোরে রাজাকার ও পাকবাহিনী আমাদের বাহিনী ওপর বিভিন্ন ঘাঁটি এলাকায় আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে যশোর জেলায় আমাদের প্রধান খাঁটি পুলুম এলাকায় তারা আক্রমণ করে। পুলুম ঘাঁটি ভেঙে গেলে আমাদের শক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবে বলে মনে করে মহম্মদপুর এলাকায় বাহিনীসহ অন্যান্য আরো এলাকার বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন না রেখে পুলুম এলাকার বাহিনীর সাথে যুক্ত করি। আমরা যখন মহম্মদপুর এলাকার বাহিনীকে পুলুম এলাকার বাহিনীর সাথে যুক্ত করি, তখন ছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগ।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে হেলেন ছিল মহম্মদপুরের দক্ষিণাঞ্চলে মহম্মদপুর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে। আমরা আমাদের বাহিনীর সামান্য শক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে মহম্মদপুর এলাকায় রেখে বাহিনীর শক্তিশালী অংশকে যেদিন পুলুম এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিলাম সেদিন যাত্রার মুর্হূতে একজন সহকর্মী এসে বলল, হেলেন নাকি আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশ্ববর্তী গ্রামের এক বাড়িতে এসেছে এবং সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার সঙ্গে দেখা করলে আমার এক –আধঘণ্টা সময় নষ্ট হবে। আর সেই কারণে আমাদের বাহিনী এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল, যার দূরত্ব প্রায় ১৪/১৫ মাইল, সেখানে যেতে বাহিনীর বিপদগ্রস্ত হবার আশংকা ভেবে এবং আমি ছাড়া ঐ সময় বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনো

বিকল্প দায়িত্বশীল পথচেনা ব্যক্তি না থাকায় তুলনামূলকভাবে হেলেনের সাথে সাক্ষাতের চাইতে বাহিনীর গুরুত্ব আমার কাছে বেশি মনে হয়েছিল। তাই ঐ সময় আমাদের বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রায়হানউদ্দিন যে ঐ সময় মহম্মদপুর এলাকায় থেকে যায় তাকে হেলেনের সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দিয়ে আমি চলে যাই পুলুম এলাকায়।

আমরা পুলুম এলাকায় পৌঁছার পর আমাদের শক্তি সুসংহত ও বৃদ্ধিলাভ করেছে এই কথা ভেবে আমাদের শক্তির সাথে শত্রুবাহিনীর শক্তির বাস্তব অবস্থা পরিমাপ না করে হঠাৎ প্রস্তাব আসে যে, আমরা শীঘ্রই শালিখা থানা ও সেখানকার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ও দখল করব। আমরা শালিখা থানার রাজাকার ক্যাম্পে রাজাকারদের সাথে পাকবাহিনী যুক্ত হয়েছে এ বিষয়ে কোনরকমের তদন্ত ছাড়াই আমাদের বাহিনী শালিখা থানা আক্রমণ করে রাজাকার বাহিনীকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের নামকরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং আমাদের বাহিনী বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই সুযোগে পাকবাহিনী আরো শক্তি সংহত করে আমাদের পুলুম ঘাঁটিতে চারিদিক থেকে আক্রমণের ব্যবস্থা করে। আর ধীরে ধীরে আমরা আক্রমণ স্থলে প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি।

পাকবাহিনী ও রাজাকারদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধের এক পর্যায়ে- সেটা ছিল অক্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহের কোনো একটা দিন। ঐদিন পাকবাহিনী ও রাজাকাররা অতর্কিতে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আমাদের পুলুম ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের বেশ ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়েও আমাদের পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে যায়। ঐদিন সন্ধ্যায় আমি দুই-এক সহকর্মীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে এক জায়গায় বসে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা কালে আমার এক পুরাতন ছাত্র এসে আমাকে একটা খবর দিতে চেয়ে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাকে খবর বলতে দেরি করছে কেন জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে জানায় যে খবরটা খারাপ তাই কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমি বললাম, যুদ্ধের সময় তো খারাপ খবর থাকবেই। এরপর সে হেলেনের রাজাকার বাহিনীর হাতে ধরা পড়া ও পরবর্তীতে তার করুণ মৃত্যু কাহিনী সম্পর্কে যতটুকু জানে তা খুলে বলে। হেলেনের মৃত্যু সংবাদে আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে পড়েছিলাম। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে বললাম, "আমরা এখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। তুমি আমাকে আর কিছুই বলো না-তুমি যাও"

হেলেনের মৃত্যুঘটনা ছিল করুণ ও মর্মান্তিক। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে আমাদের মহম্মদপুর এলাকার বাহিনী পুলুম এলাকায় মহম্মদপুর থানার এক গ্রামে অবস্থান কালে রাজাকার ও ঘাতক দালালদের গুপ্তচরের সহায়তায় হেলেন ২ বছর ৫ মাস বয়স্ক শিশু পুত্র দিলীরসহ রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে গেলে তাকে তারা সরাসরি নিয়ে আসে মাগুরা শহরে। এরপর পাকবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তাকে সোপর্দ্দ করা হয়

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। হেলেনের এই দুঃসংবাদে তার বৃদ্ধ পিতা ও কতিপয় আত্মীয়স্বজন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা হেলেনের মুক্তির জন্য শত অনুরোধ সত্ত্বেও মাগুরার জামাতপন্থী ঘাতক দালালরা তার মুক্তির ব্যাপারে সব চাইতে বেশি বাধা সৃষ্টি করে।

আলোচনায় পাকবাহিনী কর্মকর্তাকে জানায় যে, হেলেন মাগুরার বামপন্থী নেতা মাহফুজুল হক সাহেবের বোন এবং মহম্মদপুর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী প্রধান বামপন্থী নেতা আলী কদরের স্ত্রী। সুতরাং তার মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না।

তাই চরম সাম্প্রদায়িক, বাংলার স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালদের ইচ্ছাই কার্যকর হলো। হেলেনের মৃত্যু হয় ১৯৭১-এর ৫ অক্টোবর রাত্রিবেলায়। ঐ রাত ছিল সকল মুসলমানদের এক পবিত্র রাত-শব-ই-বরাত। ঐ রাতেই তারা হেলেনের শিশুপুত্র দিলীর করুণ-কান্নাকে উপেক্ষা করে তাকে মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠিয়ে দেয় নানাবাড়িতে। তারপর অমানবিক নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে হেলেনকে। আর তার লাশ জিপের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তার উপর টানতে টানতে নিয়ে যায় মাগুরা শহরের অদূরে নবগঙ্গার নদীর ডাইভারশন ক্যানেলে।

আলী কদর
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ঝামা উচ্চ বিদ্যালয়
মহম্মদপুর, যশোর

শা ও য়া ল খা ন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: নারীর শক্তির উৎস

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রয়োজন কেন দেখা দিল? জবাব খুঁজতে ফিরে দেখতে হয় বহুদূর। ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা। কালের প্রবাহ এক একটা দিনকে অবিস্মরণীয় মর্যাদায় উন্নীত করে। সেই সব দিনই ঘটনা এবং ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এক একটা বিষয়ের রূপ লাভ করে, ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীক হয়ে বিশ্বব্যাপী পতাকা ওড়ায় এবং শক্তির যোগান দেয়। তেমনি নারীর শক্তি এবং নারী আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশের ঐতিহাসিক দিন ৮ মার্চ।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একটি সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা কাজের সময় ৮ ঘন্টা, কাজের মানবিক পরিবেশ, ভোটাধিকার এবং তাদের মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট দাবিতে আন্দোলন করলে তাঁরা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। এই দিনটিকে নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করেছিলেন জার্মান সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৯১০ সালে। ১৯১১ সালে প্রথম বেসরকারিভাবে বিভিন্ন দেশে দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এর দীর্ঘ ৭৩ বছর পর ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণার পর থেকে দিনটিকে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ সরকারিভাবে নারী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। দিনটিকে ঘিরে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়।

শক্তির উৎসই হল সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টিশীলতাই তাকে গতিময় করেছে। নারী পুরুষের সহযাত্রায় সৃষ্টির আদি থেকে নারী ও পুরুষ সৃষ্টির সমান অংশীদার। কিন্তু নারী তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমাজে তার প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। এ চিত্র পৃথিবীর সর্বত্র দৃশ্যমান। অথচ দেশ বা সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবদান, প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের ওপর।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে সত্য, কিন্তু তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অনেক নিচে। তাই নারী নির্যাতন, ইভ টিজিং ও বঞ্চনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। দেশের নারীসমাজ এখনও নানা ধরনের কুসংস্কার, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার। যৌন হয়রানি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে এবং এর শিকার হয়ে আত্মহননও করেছেন অনেকে। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদকারীকে হত্যাও করা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। নামী দামি স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, বিষয়টা বড়ই লজ্জাকর। গৃহে গৃহে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত নারী-শিশু নির্যাতনের কাহিনী বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের বঞ্চনা একটি অতি সুপরিচিত ঘটনা। অথচ এ শিল্পের চাকা নারী শ্রমিকের হাতই ঘুরায়। মানবেতর জীবনযাপনই যেন এদের নিয়তি। যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় কুসংস্কার, পারিবারিক জীবনে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্য সেকেলে সমাজকাঠামো এবং বিদ্যমান প্রথা প্রভৃতি নারী অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। নারী আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নারীসমাজের ক্রমঃঅগ্রগতি সাধিত হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয় নি। সমাজে নারীর সার্বিক চিত্র মানুষ হিসেবে নারীর বঞ্চনাকেই প্রতিনিধিত্ব

করে যা আদৌ কাম্য নয়। বিচ্ছিন্নভাবে এসব অতিক্রম করার প্রচেষ্টা চলছে দেশে। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন উদ্যোগ।

জাতীয় জীবনে নারীর যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু আন্তর্জাতিক নীতি ও সনদে স্বাক্ষর করেছে, যেমন, সিডও সনদ, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন। এ সকল সনদে মানুষ ও নাগরিক হিসেবে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠাসহ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেইজিং পিএফএ-এর আলোকে ১৪ দফা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা আনুযায়ী এ নীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছর এ নীতি বাস্তবায়নে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এখন বাংলাদেশের নারী সামাজ এমন একটি নারী নীতি চায় যা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নারী তার যথাযথ মর্যাদা ও অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে।

মহাজোট সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতির সংশোধিত রূপ পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল এবং সরকার গঠনের পর ২০১১ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করে। বলা হয়েছে, ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনে সবক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১০, ১৯ (১,২), ২৭, ২৮ (১,২,৩,৪), ২৯ (১,২,৩-ক) ধারায় সবক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও পৈত্রিক সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের সমান অধিকার নেই। বাংলাদেশ কোন ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনের ভিত্তি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন পার্থক্য নেই। তবুও ছেলে ও মেয়েকে সম্পত্তির সমান ভাগ দেয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান চাপিয়ে দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অমানবিক এবং অনুচিত। এমনকি ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা স্পষ্ট করা হয়নি।

মানুষের শক্তির উৎস পরিবার। নারী যদি পরিবারেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার শক্তি গোড়াতেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব গিয়ে পড়ে সমাজ এবং জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে। দেশের পবিত্র সংবিধান মেনে নারীনীতি বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কারণ জনগোষ্ঠীর কোন অংশের বৈষম্য জিইয়ে রেখে সমাজে সুফল বয়ে আনা সম্ভব না। উন্নয়নের পথে এগিয়ে আসা দেশ মরক্কো, সেনেগাল, তুরস্ক এবং তিউনিসিয়াসহ কয়েকটি মুসলিমপ্রধান দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের সমানাধিকার দেয়া হয়েছে।

উপার্জন যদি হয় নারীর শক্তির উৎস, তাহলে বিশ্বজুড়ে আমরা কি চিত্র দেখতে পাই? উন্নত দেশের নারীরা পুরুষের চেয়ে ২৩ শতাংশ কম আয় করে, আর উন্নয়নশীল দেশে তা ২৭ শতাংশ কম। পৃথিবীর সর্বমোট কর্ম ঘন্টার তিন ভাগের দুইভাগ সময় নারীরা কাজ করে। অর্ধেক খাদ্য উৎপাদন করে, কিন্তু আয় করে মোট আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ। পৃথিবীর মোট সম্পদের ১ শতাংশেরও কম ভোগ করে নারী। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার চার ভাগের যে এক ভাগ অতি দরিদ্র (দৈনিক আয় এক ডলারের কম) জনগোষ্ঠী রয়েছে তার ৭০ শতাংশ নারী।

বিশ্বজুড়ে ১৫-৪৪ বছর বয়সের নারীর প্রতি সহিংসতার ফলে যে মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব ঘটে, তা ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, সড়ক দুর্ঘটনা বা যুদ্ধের কারণে মৃতের সংখ্যার চেয়ে বেশি। ব্রিটেনে পুরুষ বন্ধু বা স্বামী দ্বারা নিগৃহীত হয়ে স্বাস্থ্য খাতে নারীরা ব্যয় করে বছরে এক বিলিয়ন পাউন্ড। সুইজারল্যান্ড, জাপান ও বেলজিয়ামে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতি ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৩, ৬৩ এবং ৭৮ জন। বিশ্বে নির্বাহী কর্মকর্তার পদে মাত্র ১ শতাংশ নারী এবং মাত্র ৬ দশমিক ২ শতাংশ নারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত।

বিশ্বের ১৯০ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র নয়জন। সারা পৃথিবীর সংসদসমূহে নারী সদস্যের সংখ্যা ১৩ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেট জগতে ১৫ শতাংশ এবং অধ্যাপকদের মধ্যে ২৪ শতাংশ নারী। ক্ষমতার এই অসম বন্টন ভাষা প্রয়োগেও বৈষম্য এনেছে। সমাজে এই অসম অবস্থান সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে, অনেক ক্ষেত্রে নারীর বেলায় নিম্নতর সামাজিক অবস্থানকে প্রকট করে তোলে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের বিস্ময়কর উত্থান ঘটলেও, সমাজের বাস্তব চিত্র মোটেও আনন্দদায়ক নয়। শাসন প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে নারীদের অতি নগণ্য উপস্থিতি রাষ্ট্রপ্রধানের মতো শীর্ষপদে নারীদের আসীন হওয়ার গৌরবকে অনুজ্জ্বল করে দেয়। বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা জীবনের সবক্ষেত্রে বিশেষত আইনগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বঞ্চনার শিকার। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী নিরক্ষর ও রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী।

দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মাত্র ৭ শতাংশ সংসদীয় আসন নারীদের দখলে। মন্ত্রিসভায় নারীদের অবস্থান হার মাত্র ৭ শতাংশ; বিচার বিভাগের পদগুলোর ৬ শতাংশ; সরকারি চাকরি

৯ শতাংশ এবং স্থানীয় সরকারের মাত্র ২০ শতাংশ সদস্য নারী। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নারী প্রার্থী। প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় প্রধান নারী। শতকরা হিসেবে এ কৃতকার্যতার হার দাঁড়ায় ৩৩.৩৩ ভাগ। কিন্তু সাধারণ নারীর জীবনমানের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণের জীবনযাত্রার মান বদলায়নি। বদলায়নি শ্রমজীবী মেহনতী নারীর জীবন ধারা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে উচ্চবিত্ত ঘরের নারীদের ক্ষেত্রে। মূলত ক্ষমতায়নই নারীর অবস্থা পরিবর্তনের সূচক।

রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকসমূহে ১০ শতাংশ পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকলেও, মোট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারীর মাত্র ৬.৪ শতাংশ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন করপোরেশনে মোট কর্মচারীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম। সচিবালয়, সচিবালয়ের সম্প্রসারিত অংশ, বিভিন্ন অধিদপ্তর ও বিভাগে মোট কর্মচারীর ১৩ শতাংশ নারী। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে নারী শ্রমশক্তি সবচেয়ে বেশি যুক্ত হয়েছে পোশাক শিল্পে। এখানকার মোট শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশ নারী হলেও ব্যবস্থাপক পর্যায়ে নারীর সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। নারীরা বেশি মাত্রায় ওষুধ শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, পাট ও বস্ত্রকলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। জাতিসংঘের এক রির্পোটে দেখা গেছে। 'উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের মোট কাজের ৫৪ শতাংশ করে মেয়েরা। অথচ তাদের কাজের তিন চতুর্থাংশের কোন পারিশ্রমিক তারা পান না'। সবচেয়ে অসুখকর অবস্থায় বসবাস প্রান্তিক নারীদের।

জাতিসংঘ ২০১৩ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শেণ্ঢাগান নির্ধারণ করেছে 'গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অবসান'। ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে ডটকম নামের ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি মঞ্চ থেকে এবার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, (ক) মেয়েদের সংযুক্তি (খ) ভবিষ্যতের প্রেরণা। দুটো বিষয়ই বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা বেড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। ম্যানিলা ভিত্তিক সংস্থা সোশ্যাল ওয়াচের ২০১২-এর লিঙ্গসমতা সূচকে (জেন্ডার ইকুইটি ইনডেক্স) বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান ভারত পাকিস্তানের ওপরে।

নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের মধ্যে মজুরির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে কম পান। পুরুষ সহকর্মীদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বিস্তারে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অবসান হয়নি। বিস্তার ঘটেনি সমাজ ও পরিবারে নারীর ক্ষমতায়নে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের দেশে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সংবাদমাধ্যমে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে চলে বিশেষ আলোচনা পর্যালোচনা, টক শো ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা, পশ্চাৎপদতা এবং বৈষম্য রয়েই যাচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন এদেশে আছে, কিন্তু কঠোরভাবে তার প্রয়োগ হচ্ছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীর প্রতি সহিংসতার বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, হত্যাসহ নানা রকমের সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইভ টিজিং বা উত্ত্যক্তকরণ। শক্তিশালী আইন কানুনও যদি ব্যর্থ হয় তা হলে নারী মুক্তির উপায় কি?

তবে আশার কথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারী সক্রিয় হচ্ছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও নারী নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করছে। তা হলে আমাদের ধরে নিতে হবে নারীমুক্তির অন্যতম উৎস শিক্ষা অর্জন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। দুই দশক ধরে সবার জন্য শিক্ষার স্লোগান মাথায় নিয়েও বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী শিক্ষার নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি থেকে বেরুতে পারছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ নারী শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে এসে ঝরে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় সমান, কিন্তু ক্রমশ ওপরের দিকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বেশি। এটা রোধ করতে পরিবারসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারের একার পক্ষে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৪৫:৫৫। ২০০৮ সালে এই অনুপাত ছিল মেয়ে ৫০:৪৯। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে, প্রাথমিক স্তরে এখন মোট শিক্ষার্থী এক কোটি ৬৩ লাখ ১২ হাজার সাত জন। এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৮২ লাখ ৭৭ হাজার ৫৫৪। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪ লাখ ৬৫ হাজার ৭৭৪ জন। এই স্তরে ছাত্র ৪৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ, ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩ দশমিক ৩১ শতাংশ। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব মতে ১৯৯০ সালে মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলের অনুপাত ছিল ৩৪:৬৬ ২০০৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গসমতা আসে, বর্তমানে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় বেশি।

স্বাধীনতার চার দশকে নারী শিক্ষার গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাম্প্রতিক সময়ে উপবৃত্তির পাশাপাশি

মেয়েদের বিনা মূল্যে বই, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানসহ নানা উদ্যোগ শিক্ষার হার বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে, মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের সংখ্যা বাড়লেও নারী শিক্ষকের অনুপাত প্রাথমিকের তুলনায় কম, মাধ্যমিকে মোট শিক্ষক রয়েছেন দুই লাখ ১৮ হাজার ১১ জন। তাদের মধ্যে নারী শিক্ষক ২৩ দশমিক ১ শতাংশ। এই স্তরেও ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগের বিধান আছে, কিন্তু তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। নারীমুক্তির উৎস যদি বলি শিক্ষা, সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। ৮ মার্চ ২০১২ সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩১টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন ১৩ লাখ ৮২ হাজার ২১৬ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিলেন পাঁচ লাখ ৫২ হাজার ৯৮৮ জন (মোট শিক্ষার্থীর ৪০ শতাংশ।)

ব্যানবেইসের ২০০৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া দুই লাখ ৬৩ হাজার ৫৪১ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ৮২ হাজার ৪৪২ জন।

আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারীর শক্তির উৎস পরিবার, অর্থ, অর্থ উপার্জন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। আমাদের কাছে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে নারীর অর্জিত শক্তির সাথে সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র কাঠামো পর্যন্ত জড়িত। সুতরাং নারীর শক্তি অর্জনের পথ সুদৃঢ় এবং বিস্তৃত করতে হলে সমাজের সর্বস্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য।

স্বাধীনতার পর বিগত চার দশকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নারীর জীবনাচারে। এপরিবর্তন ইতিবাচক। অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্ব শ্রম বাজারে নারীকর্মীর চাহিদা বাড়ছে। দেশের শ্রম বাজারে ১৯৯৩ সালে যেখানে নারীর কর্মসংস্থানের হার ছিল ৮.৪ শতাংশ, সেখানে ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪.৫ শতাংশে। এটি যে কেবল তৈরি পোশাক খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুবাদেই সম্ভব হয়েছে তা নয় বরং হোটেল, রেস্তোরা, পরিবহন শিল্প, আবাসন শিল্প, টেলিযোগাযোগ, ব্যাংকিং ও বীমার মত নন-ট্র্যাডিশনাল ও বিকাশমান খাতগুলোতেও নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। মোট নারী শ্রমশক্তির মাত্র ১.৩৯ শতাংশের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। দেশের বর্তমান কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অনুপাত হল ৩:১। এছাড়া নারীদের বেকারত্বের হারও পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি। যেখানে ৭.৫ শতাংশ নারী বেকার, সেখানে পুরুষ বেকারত্বের হার হল মাত্র ৪.৩ শতাংশ। দেশে নারীরা গড়ে পুরুষের ৭০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। নারীদের মোট কর্মসংস্থানের ৮৫.৬৯ শতাংশই কাজ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশেও পুরুষদের তুলনায় নারীর আয় ২০ শতাংশ কম হয়।

বিশ্ববিখ্যাত বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্সের এক হিসেবে দেখানো হয়েছে, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বাড়িয়ে পুরুষের সমান পর্যায়ে উন্নীত করা হলে তাতে বিভিন্ন দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার এ হার ইতালিতে ২১ শতাংশ স্পেনে ১৯ শতাংশ; জাপানে ১৬ শতাংশ; আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানিতে ৯ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে ৮ শতাংশ হবে। বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী নারীকর্মীর সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। এখন প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ হাজার নারীকর্মী বিদেশে যাচ্ছেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, লেবানন, কাতার, কুয়েত, মরিশাস, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে বর্তমানে দুই লাখের বেশি নারী শ্রমিক কাজ করছেন।

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯১ থেকে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক লাখ ৮৭ হাজার ১৩১ জন নারী চাকরি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেছেন লেবাননে। এই সংখ্যা ৫৮ হাজার ৪৫২ জন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৫১ হাজার ৫০৮ জন, সৌদি আরবে ৩১ হাজার ৫৪২ জন, জর্ডানে ১২ হাজার ৫৩৮ জন, মরিশাসে আট হাজার ৯৭৫ জন, কুয়েতে সাত হাজার ৬৫৮ জন, মালয়েশিয়ায় ছয় হাজার ৪৬৮ জন, ওমানে চার হাজার ১২৮ জন ও বাহরাইনে তিন হাজার ৪৮৭ জন নারীকর্মী গেছেন। এর বাইরেও লিবিয়া, সিঙ্গাপুর, ইতালি, হংকং, সাইপ্রাস ও ব্রুনেই-এ কাজ করেন অভিবাসী নারীকর্মীরা। আবার বিভিন্ন দেশে নারী শ্রমিকদের একটা অংশ নির্যাতন, নিপীড়ন ও হয়রানির শিকারও হচ্ছেন।

নারীর শক্তির উৎস এককভাবে নারীর নিজের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পরিবার, সমাজ, প্রতিবেশী, পরিবেশ, প্রকৃতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, তথ্য প্রযুক্তি এবং কূটনীতিসহ আরো অনেক কিছুতে। তবে সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্রের ব্যবহারিক চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তি মানুষের এবং সমষ্টিগত মানুষের অর্জনকে তুলে ধরা এবং বিকশিত করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম রাষ্ট্রের ব্যবহারিক চরিত্র। ব্যক্তি মানুষ এবং সমষ্টিগত মানুষের আইন অধিকার ও সংস্কৃতির সাথে রাষ্ট্রের যোগ অনস্বীকার্য।

শাওয়াল খান
কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও গবেষক

কুমার প্রীতীশ বল

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পাহাড়ের নেত্রী কল্পনা চাকমা'র কথা

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০১৪ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়, 'নারী প্রগতি রাষ্ট্র সমাজ প্রগতি।' প্রতি বছরের মতো নারী দিবস পালনে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। প্রত্যেক দেশ তার নিজ নিজ সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ থেকে নারী দিবস উদযাপন করে। কয়েকটি দেশে নারী দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও বাংলাদেশে এই দিনটিতে ছুটি নেই। তবে নানামুখী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বেশ আড়ম্বরেই পালিত হয় দিবসটি।

৮ মার্চ সারা বিশ্বে যখন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হচ্ছে, অন্যদিকে তখন নারী সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য অনেকদিন থেকে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে এতো পদক্ষেপ সত্ত্বেও তার কোন বাস্তবায়ন নেই। ২০১৩ সালে মহিলা পরিষদের এক জরিপে দেখা যায়, দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪ হাজার ৭শ ৭৭টি। যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, নারী আত্মহত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এই যুগেও চলমান । অধিকতর সংখ্যায় আদিবাসী নারীরা এই বর্বরতার শিকার। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আহবান বর্বরদের হাত থেকে আদিবাসী নারীদের সুরক্ষা দিতে পারছে না।

এটা আজকের কথা না। আজকে যে সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। হচ্ছে না অনেকদিন আগে থেকেই। পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনা লক্ষণ নেই।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের মনে কি পড়ে না কল্পনা চাকমা নামের আদিবাসী নারী নেত্রীর কথা? আর মাত্র ক'দিন পর জাতিসংঘ আয়োজিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগ দিতে চীনের রাজধানী বেজিং যেত মেয়েটি। এজন্য নাকি একসেট নতুন সালোয়ার কামিজও বানিয়েছিল। সেই মেয়েটিই নাকি অপহরণ হয়ে গেল। জলজ্যান্ত একটা নারী নাই হয়ে গেল!

কল্পনা চাকমার জন্মস্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলার বাঘাইচড়ি উপজেলার নিউ লাইল্যাঘোনা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা বাঘাইছড়ি কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহারা কল্পানা চাকমা ছিলেন পরিবারের প্রথম লেখাপড়া জানা সদস্য। নিরক্ষর মা এবং জুম চাষী ভাইদের সহায়তায় কল্পনা চাকমা পরিবারের সকলের স্বপ্ন বাস্তবায়নরে পথে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কল্পনা চাকমার এই শিক্ষা তাকে নিজ সমাজ এবং স্বজাতি সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই জুম্ম আদিবাসী লোকসকলের বিশেষ প্রেরণার উৎসে পরিণত হন। কল্পনা চাকমা ছিলেন সমকালের অপরাপর আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী অনেকের চেয়ে সচেতন। স্পষ্টভাষী এবং পরিশ্রমী, অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কল্পনা চাকমা নিজের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাকে আড়াল করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী লোকসকলের বিশেষ করে জুম্মনারীদের কষ্টগুলোকে বড় করে দেখেছেন। এ কারণে তাকে অচিরেই শাসক এবং শোষকশ্রেণীর প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হতে হয়।

১৯৯৬ সালের ১১ জুন মধ্যরাতে সামরিক পোশাক পরিহিত কয়েকজন লোক কল্পনা চাকমার ঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রথমে তার ছোটভাই লাল বিহারী চাকমা (ক্ষুদিরাম) পরে কল্পনা চাকমা এবং বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমাকে (কালিচরণ) কে ধরে নিয়ে যায়। পাহাড়ি পথে এদের নিয়ে যাওয়ার সময় একে একে ক্ষুদিরাম এবং কালিচরণ পালাতে সক্ষম হলেও কল্পনা চাকমা, যিনি আজকের আদিবাসী নতুন প্রজন্মের সন্তানদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে নতুন প্রেরণার উৎস, তিনি সেই রাতের আঁধারে সামরিক পোশাক পরিহিতদের হাত থেকে ছুটে যেতে পারেননি।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার এই অপহরণ দেশ বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদ দেশ বিদেশে অনেক হয়েছে। এজন্য হতাহতের সংখ্যাও কম না। ১৯৯৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন হয়। এর সঙ্গে পুলিশ তদন্ত পরিচালনা করেন। সেদিন অপহরণ করতে যারা এসেছিল, তাদের তিনজনকে কল্পনা চাকমার ভাই ক্ষুদিরাম চিনেছিলেন। এদের নাম তিনি পরবর্তী কালে তদন্ত কমিশনের সামনে বলেছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দেয়। কমিশনের রিপোর্ট বাংলাদেশের আরো শত, সহস্র তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের মতো আলোর মুখ দেখেনি।

কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের বিচার আর হয়নি। কল্পনা চাকমা আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। সেদিনের পর তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে, আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে, এমনকি কয়েকটি মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে খোঁজ নিয়েও কোনো সুরাহা করা যায়নি। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে কল্পনা

চাকমাকে পাওয়া গিয়েছিল বলে খবর প্রকাশ করলেও পরবর্তী কালে তার সত্যতা মেলেনি। তবে চট্টগ্রামভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন দাবি করেছে, কল্পনা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের শিকার। এটাকেও সত্য বলে মানতে পারছে না আদিবাসী লোকসকল। কারণ তাদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে অপহরণকারীর নাম।

কল্পনা চাকমা'র খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে কয়েকজন সাংবাদিক তাঁর বাড়ি থেকে একটি ডায়রি সংগ্রহ করেছেন। কল্পনা চাকমা এই ডায়রিতে লিখে রাখতেন প্রতিদিনের নানান ঘটনা এবং মন্তব্য। ডায়রির শুরুতেই তিনি লিখেছেন, 'জীবন অর্থ সংগ্রাম এবং এখানে তুলে ধরা হচ্ছে এক সংগ্রামমুখর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা।' কল্পনা চাকমা ডায়েরিতে ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, 'ছাত্র জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে, দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা। দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষ বিলাইয়া দিবা– ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র জীবনেই করিতে হইবে।'

কল্পনা চাকমা এই সাধনা করেছেন এবং নিজের জীবন সত্যিকার অর্থে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি যুব আন্দোলন সম্পর্কেও লিখেছেন। খাগড়াছড়ি টাউন হলে অনুষ্ঠিত হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সমবেত নারীদের উদ্দেশ্য এবং নানিয়ার চরের শহীদদের স্মরণে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য থেকেও একজন দৃঢ়চেতা আত্মসচেতন মানুষের অবয়ব ফুটে ওঠে। এখানে তাঁর রাজনৈতিক চেতনাবোধেরও পরিচয় মেলে। তিনি সমাজসচেতন একজন দূরদর্শী জুম্ম নারী হিসাবে ভবিষ্যতে সম্মানীত হবেন। তাই কল্পনা চাকমা আজও সহপাঠী এবং সহযোদ্ধাদের স্মৃতিতে একটি উজ্জ্বল নাম। কল্পনা চাকমার সহযোদ্ধা কবিতা চাকমা এজন্যই অকপটে উল্লেখ করতে পারেন, 'হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে কল্পনা পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতন তুলে ধরতে ও জুম্ম নারী সমাজকে জাগিয়ে তুলতে ও সংগ্রামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে সব সময় কাজ করত এবং প্রতিটি মুহূর্তে কাজের জন্য প্রস্তুত থাকত। বাঘাইছড়ির এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও তার চিন্তা, চেতনা ছিল অগ্রসর ও প্রগতিশীল। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বিভিন্ন বই, পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়তেন তিনি। বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন জনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখতেন।' এ সবকিছুই একজন অগ্রণী নেত্রীর বৈশিষ্ট্য। আমাদের ধারণা, তাঁর এই প্রাগ্রসর বোধশক্তি তাঁর জন্য এমন মর্মান্তিক পরিণাম বয়ে এনেছে। প্রাগ্রসর চিন্তার ধারক বাহকদের কখনও স্বৈরশক্তি ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কল্পনা চাকমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কল্পনা চাকমা অপহরণ হয়েছেন ১৮ বছর হয়ে গেল। আজও প্রমাণ হলো না, সে এখন কোথায়? কে নিল বা কেন নিল? তখন ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারপর এলো আওয়ামী লীগ সরকার, বিএনপি সরকার, তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আবার আওয়ামী লীগ সরকার। কেউ হদিস দিতে পারল না। ১৮ বছরে কল্পনা চাকমার মামলার তদন্ত করেছেন ৩৫ জন কর্মকর্তা। ৩৫তম তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিদর্শক মো. শহীদুল্লাহ ২০১-এর সেপ্টেম্বের মাসে রাঙামাটির মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেন তাতে লিখেছেন-'আমার তদন্তকালে উপযুক্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে কল্পনা চাকমাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। এমনকি তাহার সঠিক অবস্থানও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। ... অদূর ভবিষ্যতেও যে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে- তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ভবিষ্যতে কল্পনা চাকমা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া গেলে বা উদ্ধার করা সম্ভব হইলে যথানিয়মে মামলাটির পুনরায় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

'এভাবেই ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি শেষ করে দিতে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ।'(*প্রথম আলো* ৭ জানুয়ারি ২০১৩)।

আমরা, কল্পনা চাকমার পরিবার, আদিবাসী স্বজনেরা কার হাতে ছেড়ে দেব আমাদের প্রিয় স্বজনের সন্ধানের ভার?

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, সাজেক নারী সমাজ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, ঘিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড এক বিবৃতিতে কল্পনা চাকমার অপহরণ বিষয়ে সিআইডির দাখিল করা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, অপহরণকারীরা চিহ্নিত ও পরিচিত হওয়ার পরও উক্ত রিপোর্টে তাদের নামোল্লেখ করা হয়নি। সিআইডির তদন্তকে প্রহসন আখ্যায়িত করে বিবৃতিতে তারা বলেন, উপনিবেশিক শাসনামলে বৃটিশ শাসকরা ভারতে যেভাবে খুনী ও দাগী আসামিরা ইংরেজ হলেই তাদের রক্ষা করত, পাকিস্তান শাসনামলে পাঞ্জাবী শাসকরা যেভাবে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ সালাম-বরকত-রফিকদের খুনীদের রক্ষা করেছে, অনুরূপভাবে এ দেশের শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের মরিয়া হয়ে রক্ষা করে চলেছে। আর শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের আচরণের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত অসংখ্য গণহত্যা ও হামলাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত কারোর বিচার ও শাস্তি আজও হয়নি। ৭ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান।

আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি। আমরা আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করি। আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করি। কিন্তু এসবের কোনোটায় কল্পনা চাকমাদের ন্যায় বিচার এনে দিতে এখনও সমর্থ হইনি। তাহলে এসব আয়োজনের যৌক্তিকতা নিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন তোলে তাহলে কি খুব অন্যায় হবে? আমি দিবস উদযাপনের বিরোধী না। এর প্রভাব কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে অথবা কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা তা দেখার সময় এসেছে। আমরা যদি এসব দিবসের প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নে আন্তরিক হই, তবে কল্পনা চাকমারা অপহৃত হবে না। নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণকারীর দৃষ্টান্তমূলক বিচার হবে ।

কুমার প্রীতীশ বল
সমন্বয়ক, উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ, এফআইভিডিবি

সা রা জা মা ন

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশ

বাংলাদেশে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু 'যৌন হয়রানি' নারীর সামনে এগিয়ে যাবার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। যৌন হয়রানিকে সাধারণভাবে 'ইভটিজিং' নামে হালকা করে দেখার একটা প্রবণতা সমাজে রয়েছে। এর ভয়াবহতা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে মেয়েদের সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, মেয়েরা নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করে এবং চলাচলের পথে উত্ত্যক্ত হবার ভয়ে প্রায়শই ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এছাড়া পরিবারের 'মান-সম্মান' বিবেচনা করে পিতামাতা পরিণত বয়সের আগেই বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে মেয়েটির জীবন সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ভাল কিছু করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ে। এছাড়া যৌন হয়রানির শিকার হয়ে অনেক নারী ও শিশু আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয়।

'যৌন হয়রানি' শুধুমাত্র বাংলাদেশের বা দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা নয়। এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী মেয়েদের শতকরা ৮০ ভাগ নারীই কমবেশি যৌন হয়রানির এর শিকার হচ্ছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর পরিমাণ বেশি এবং এর ফলে এসব দেশে আত্মহত্যার ঘটনাগুলো বেশি ঘটে থাকে।

বাংলাদেশে ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির একটি গবেষণায় দেখা যায় ৯১% নারী কোন কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়। এছাড়া, মহিলা পরিষদের নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১২ অনুসারে দেখা যায় যে, ১২ ধরনের বিভিন্ন নারী নির্যাতনের মধ্যে ৪৮% নারী যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয় এবং নির্যাতিতদের বেশির ভাগই পরিচিতজন দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন এবং ৫০ শতাংশ নারী 'চিহ্নিত সন্ত্রাসী' ও 'বখাটে'র মাধ্যমে হয়রানির শিকার হন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নির্যাতিত নারীদের একটি বড় অংশ নিকট আত্মীয় বা পরিজন দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। পরিবার যেখানে একজন শিশুর নির্ভরতার জায়গা সেখানে এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা একজন শিশুর মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। যৌন হয়রানি যারা করে তাদের কোন নির্দিষ্ট বয়স বা শ্রেণি নেই। যে কোন বয়সের যে কোন বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি এ ধরনের অন্যায় আচরণ করে থাকে।

এ ধরনের অপরাধের সাথে যারা যুক্ত থাকে তাদেরকে The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus গ্রন্থে, দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। (Deiech et al.,)

১. প্রকাশ্য হয়রানিকারী: যারা সহকর্মী, অধঃস্তন, শিক্ষার্থীদের প্রতি যৌন আচরণ প্রকাশ করে।

২. প্রচ্ছন্ন হয়রানিকারী: যারা খুব সতর্কভাবে নিজেদের সম্মানের একটি জায়গা তৈরি করে নেয় কিন্তু যখন তার টার্গেট করা ব্যক্তিটিকে একা পায় তখন আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কোন কোন গবেষক আবার এ ধরনের হয়রানিকারীদেও তিন ভাগেও ভাগ করেছেন। অর্থাৎ দেখা যায় বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করা কিংবা ক্ষমতার জোরে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে নারীর প্রতি এ ধরনের আচরণ করে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের আচরণের শিকার হয়ে নির্যাতিত নারী ও সমাজের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, আমাদের প্রচলিত আইনী কাঠামোতে এর কী ধরনের প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলো কী কী?

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে যৌন হয়রানির প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিভিন্ন সময় উঠে আসলেও প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিষয়গুলো গুরুত্বহীন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৪টি জাতীয় পত্রিকা থেকে নেয়া মহিলা পরিষদের তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ২০১০-২০১৩ সময়ের মধ্যে মোট ২৯৩০ টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ১০৪ জন নারী হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার করেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী । যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বেশি। পরিবারের 'মান-সম্মানের' কথা ভেবে বিষয়গুলোকে সবার সামনে প্রকাশ করা হয় না। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের

যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত নারী নির্যাতন জরিপ ২০১১ (প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৩) প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১১.০৮ শতাংশ নারী ও মেয়েরা বলেছে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার হন এবং এবং ১০.১১ শতাংশ বলেছে তারা কোচিং সেন্টারে যৌন হয়রানির শিকার হন। এছাড়া সম্প্রতি ইউএন উইমেন পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় ৭৬% শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির শিকার হন। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রী অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার হয়, ২৫ শতাংশ হয় নিজ সহপাঠী দ্বারা এবং ৭ দশমিক ৯ শতাংশ হয় ক্যাম্পাসে আসা অন্য পুরুষদের দ্বারা। এছাড়া নিজেদের বিভাগ ও অন্য বিভাগের পুরুষ শিক্ষকদের মাধ্যমেও মেয়েরা হয়রানির শিকার হয়। হয়রানির শিকার মেয়েদের ৯০ শতাংশই কোনো ধরনের প্রতিবাদ করেনি। দেখা যায় যে লজ্জা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীরব থাকার মানসিকতা, আইনে কঠোর শাস্তি অভাব ইত্যাদি কারণে মেয়েরা প্রতিবাদ করে না। এছাড়া যৌন হয়রানি বিষয়ে সচেতনতার অভাবের কারণে এই বিষয়গুলো স্বাভাবিক একটি বিষয় মনে করে হালকা করে দেখা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটেস্টিকস পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুল ঝরে পড়া জরিপ ২০১১ থেকে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে প্রধান শিক্ষকগণ যৌন হয়রানিকে চিহ্নিত করেছেন। জরিপে বলা হয়, যৌন হয়রানির কারণে ৫.১ শতাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এছাড়া ২০০৮ সালে Harassment: the effects of "eve teasing" on the development in Bangladesh প্রতিবেদনে বাংলাদেশে মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে 'যৌন হয়রানি' কে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া 'উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয়ে বাল্যবিবাহ'-এ ধরনের সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। কিন্তু দেখা যায়, এর প্রতিকারে তেমন কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের বিষয়টি জানাজানি হলে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও অভিভাবক মেয়েকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে দিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় না। আবার অভিভাবকদের মানসিকতা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অপরাধ না করেও একটি শিশুকে বাল্যবিয়ের মতো একটি ভয়াবহ পরিণতিকে মেনে নিতে হয়।

বিষয়গুলো সাধারণভাবে যদিও অনেক হালকা করে দেখা হয়, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তবে আশার কথা, এখন বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সংস্থা থেকে 'যৌন হয়রানি'কে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসছে এবং বিভিন্ন গবেষক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সামাজিক কারণগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে 'যৌন হয়রানি'কে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে শুধু সমস্যা চিহ্নিত করলেই হবে না। এর সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং এর জন্য দরকার নীতি-নির্ধারক থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং বাস্তবায়নের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা।

এখানে উল্লেখ্য, যৌন হয়রানির ভয়াবহতা বিবেচনা করে মহামান্য হাইকোর্ট ২০০৯ সালের ১৪ মে একটি যুগান্তকারী রায়ে কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

ক) যৌন নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

খ) যৌন নির্যাতনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

গ) যৌন নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা।

দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালাসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পালন করা বাধ্যতামূলক। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ ও পালন করা হবে। এছাড়া এই রায়ে যৌন হয়রানি হিসেবে কোন্ কোন্ আচরণকে বিবেচনা করা হবে এ সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী প্রদান করা হয়। রায় অনুযায়ী যেসব আচরণ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে তা হল:

- যে কোন অবাঞ্ছিত শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;
- প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা;
- যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি বা মন্তব্য;
- যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন/দাবি;
- পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন;
- যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য /অঙ্গভঙ্গি;
- অশালীন ভঙ্গি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা ব্যবহার বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা পেছন পেছন যাওয়া, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে উপহাস করা;
- চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল, ফেইসবুক, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;

- ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা;
- যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির মাধ্যমে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;
- প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

এছাড়া এর ভয়াবহতা বিবেচনা করে ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি হাইকোর্ট 'ইভ টিজিং'কে যৌন হয়রানি বিবেচনা করে আইনে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে গোপনে অনুসরণ করার বিষয়টি যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

তবে বাস্তবে দেখা যায় যে, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাবলী অনুসারে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের 'যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ কমিটি' গঠনসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হলেও হাতে গোনা দু'একটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অথবা নামেমাত্র কমিটি গঠন করলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বৈষম্য, যৌন হয়রানী, নির্যাতন দমন এবং নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতনতামূলক প্রকাশনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণির কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীগণকে এবং সকল কর্মক্ষেত্রে মাসিক ও ষান্মাসিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা রাখাসহ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে হাতে গোনা দু'একটি প্রতিষ্ঠান ব্যাতীত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেনি।

মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের এই নির্দেশানাবলী কার্যকর করার জন্য সরকারি যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। সরকারের পক্ষ থেকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কিছু উদ্যোগ যেমন: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্কুল পর্যায়ে কাউন্সেলিং ও মতবিনিময়, হয়রানিকারীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের জন্য ভ্রাম্যমান আদালত চালু করা ইত্যাদি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তবে মনিটরিং-এর অভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সরাসরি কোন কঠোর আইন নেই। তবে প্রচলিত আইনে এর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩) এর ধারা: ১০-এ যৌন হয়রানিকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই অপরাধে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক দশ বছর অন্যূন তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করতে পারেন এবং তার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে ও দণ্ডিত করতে পারেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধন ২০০৩) এর ৯ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কোন কাজ দ্বারা সম্ভ্রমহানি হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করলে ঐ ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কাজ দ্বারা আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করার অপরাধে অপরাধী হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তি অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।' বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা মোবাইল কোর্টের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করে ১০ নভেম্বর ২০১০ গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারা বলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ বখাটেদের সর্বোচ্চ এক বছরের দণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবেন। এছাড়া আরও কিছু আইনে যৌন হয়রানি বিষয়ে যৌন হয়রানির শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন: দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯৪ ধারা, ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৭৬ ধারা, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৩ ধারা, পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২।

কিন্তু দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষ এমনকি প্রশাসনের অনেকেই যৌন হয়রানি আইন ও শাস্তি সম্পর্কে জানে না। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার তেমন কোনও উদ্যোগও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করলেই হবে না; এর প্রয়োগের পাশাপাশি যৌন হয়রানির ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিরোধ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। যৌন হয়রানির প্রতিকার ও প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের বাস্তবায়নের জন্য সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে তুলতে হবে।

সারা জামান
ম্যানেজার, মেয়েদের জন্য নিরাপদ নাগরিকত্ব কর্মসূচি
জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি বিভাগ, ব্র্যাক

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

তবুও গেল না আঁধার

‘বিচার না পেয়ে ঘাতক হয়েছি: মেয়ের উত্ত্যক্তকারীকে হত্যার দায়ে গ্রেফতারকৃত মা’; ‘স্বামীর নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ হাসপাতালে’; ‘চট্টগ্রামে মা মেয়ে খুন: মেরে ফেলেছি জাস্ট একটু খারাপ লাগছে: রায়হান’; ‘প্রেম প্রতারণায় কিশোরীর আত্মহত্যা’; ‘পরীগঞ্জে নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ পারুল’; ‘বরিশালে নারী পুলিশকে উত্যক্ত করায় দুই বখাটে আটক’ – এই শিরোনামগুলি ২০১৪ সালের মার্চ মাসে একই দিনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নারী নির্যাতন তথা নারীর অধিকার লঙ্ঘনের কিছু ঘটনার সংবাদের। তবে প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে নারী নির্যাতনের যে পরিমাণ সংবাদ প্রকাশিত হয়, প্রকৃত ঘটনার সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশী বলেই নারী অধিকার ও অপরাধ-বিশ্লেষকদের ধারণা।

সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখা যায় নারীর প্রতি সংহিংসতার ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। উৎপীড়কের ভূমিকায় কখনো থাকেন স্বামী, কখনো গ্রামের প্রভাবশালী গ্রাম্য মাতব্বর, বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের সদস্য, বখাটে, মাস্তান, কখনো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, আবার কখনো প্রকৃত মানুষ গড়ার দায়িত্ব যে শিক্ষকের তিনি নিজেই, এমনকি ধর্মের ঝাণ্ডাবাহী বলে যারা নিজেদের জাহির করে তারাও আছেন।

নারী তথা কোন জাতিকে লাঞ্ছিত করার চরম অস্ত্র হলো ধর্ষণ। যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ, সেই দুঃসময়ের দিনগুলোতে পাকিস্তানী সেনা ও তাদের দোসরদের হাতে ২ লাখ বাঙালী নারী নির্যাতনের শিকার হয়। নারী ধর্ষণ, নির্যাতন ছিল পাক সেনাদের নিত্যদিনের খেলা। বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ চলত প্রকাশ্যে। গণ ধর্ষণে প্রাণ চলে যেত অনেক নারীর। বহু দেশীয় রাজাকার তাদের এমন ঘৃণ্য কাজে সহায়তা প্রদান করত। আজ বংলাদেশের কোথাও পাক সেনা নেই। কিন্তু নারী ধর্ষণ, নির্যাতন আজও শেষ হয় নি।

২০১৩ সালে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন ‘আইন ও সালিশ কেন্দ্র’র তৈরি করা প্রতিবেদনে দেখা যায়, জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর সময়কালে সারাদেশে ৯৯৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এদের মধ্যে ৮৭ জনকে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা হয়েছে, ধর্ষিতা হয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করে জ্বালা মিটিয়েছেন ১৪ জন। শিশুরাও বাদ যায়নি চরম এই নির্যাতনের ঘটনা থেকে, এই সময় কালে ৬ বছর বা তার কম বয়সের ৬৩ জন, ৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ১২৫ জন আর ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৯৯ জন শিশু-কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে গণধর্ষণ ঘটনাও। ধর্ষণ বিষয় একাধিক ঘটনার সংবাদে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৮ জানুযারীর *ইত্তেফাক* পত্রিকায় পুলিশ বাহিনীর এক সদস্য কর্তৃক এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগের সংবাদ প্রকাশ পায়। ১৮ ফেব্রুয়ারির *নিউ এইজ* পত্রিকায় ধর্ষণের দায়ে পুলিশ ক্লোজের, ২৩ মার্চ তারিখে *আমার দেশ* পত্রিকায় সেনা সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের এবং ৭ অক্টোবর পুলিশ হেফাজতে ৫ কনষ্টেবল কর্তৃক ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশ পায়।

চলতি ২০১৪ সালে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি সময়কালে ৭১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯ জনকে, ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ১ জন।

নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটে নানাভাবে, নানা পন্থায়; কখনো এসিড নিক্ষেপে ঝলসে যাচ্ছে মুখ, কখনো যৌতুকের দাবী পূরণ না করতে পারায় গায়ে কেরাসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, কখন বা শিকার হচ্ছে উত্যক্তকরণের, কখনো স্বামী কিংবা পরিজনকে বেঁধে রেখে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আবার কখনও নগ্ন করে ছবি তুলে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী খোদ রাজধানী ঢাকাতেই যৌন হয়রানি বিগত বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে জানিয়েছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী গত এক বছরে ঢাকায় ধর্ষণের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ৭৬ জন নারী। যা ২০১১ সালের চেয়ে ২৮ জন বেশি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী ২০১৩ সালে উত্যক্তকরণে শিকার হয়েছে ১৮২ জন নারী আর এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৯১ জন পুরুষ। উত্যক্তকরণের শিকার ১৮২ জন নারীর মধ্যে ১৪ জন আত্মহত্যা করেছে আর ৯ জন স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

ব্র্যাকের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৩ সালের জুন থেকে এ পর্যন্ত ৪৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ স্কুল ছাত্রী উত্যক্তের শিকার হয়েছে। আর প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় হুমকি-ধমকির শিকার হয়েছে ৪৯ দশমিক ২৫ শতাংশ ছাত্রী।

২০০০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৫১১৩ জন নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেছে। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনার ঘটেছে ১০৫৬৮টি, ধর্ষণজনিত কারণে ১৬৬৮টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, যৌতুকের কারণে ২৯৯৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে, পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪৩৭৪টি। অবৈধ সালিস ও ফতোয়ার ঘটনার ঘটেছে ৫০৩টি। আর এই সময়কালে সংবাদপত্রের সূত্র অনুযায়ী ১২৬১ জন গৃহ-কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বছরওয়ারী এই ঘটনাগুলির বিস্তারিত বিবরণ নীচের সারণীতে দেয়া হয়েছে।

সারণী: বছরওয়ারী ধরণ অনুযায়ী নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা

বছর	ধর্ষণ/ ধর্ষণের চেষ্টা	ধর্ষণ জনিত কারণে মৃত্য	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	যৌতুকের জন্য হত্যা	এসিড সন্ত্রাস	অবৈধ সালিস ও ফতোয়া	পারিবারিক নির্যাতন	গৃহকর্মী নির্যাতন	মোট
২০০০	৭৪৮	১০৭	৯৩	১৮৮	১৬৫	৩১	৩৪২	৮৫	১৭৫৯
২০০১	৬৫৬	১২২	৮৪	১২৫	১৭৭	৩৪	২৫৩	৫১	১৫০২
২০০২	১২৬৩	১৪৯	১০২	২৫৬	২৬২	৩২	৩৫০	৮০	২৪৯৪
২০০৩	১২১০	১৭১	১২৯	২৪৫	২৪৯	৪৬	৩৩১	৯৩	২৪৭৪
২০০৪	৮৩৫	১৪২	১২২	২৩০	২২৮	৩৫	২৬৪	৮৩	১৯৩৯
২০০৫	৭০৮	১২৭	১২০	২৩৬	১৩০	৪৬	৩৯৩	১১৫	১৮৭৫
২০০৬	৫৭৬	১৬২	৩৩৪	৭০	১৪২	৩৯	৩০১	১০৭	১৭৩১
২০০৭	৫৩৬	৯৮	৯১	২০৩	৯৫	৩৫	২৮৩	৮৩	১৪২৪
২০০৮	৩৯৫	৯১	১১৭	১৭৯	৮০	২০	৩১২	১১০	১৩০৪
২০০৯	৩৭৯	৬৭	৯০	১৯৫	৬৩	৩৫	২৮১	৭৮	১১৮৮
২০১০	৫৪০	৮৬	১৫৩	২৪২	৯৩	২২	৩৯৭	৮১	১৬১৪
২০১১	৮০৬	১৩৩	১৪১	৩৬১	৬৩	৫৯		১১৭	১৬৮০
২০১২	১০৩৭	১১২	১৫৬	২৮২	৬৮	৪৮	৪৮২	১০০	২২৮৫
২০১৩	৮৯৭	১০১	১৩৩	১৮৫	৪৪	২১	৩৮৫	৭৮	১৮৪৪
মোট	১০৫৮৬	১৬৬৮	১৮৬৫	২৯৯৭	১৮৫৯	৫০৩	৪৩৭৪	১২৬১	২৫১১৩

এছাড়া এই সময়ে অশ্লীল মন্তব্যের শিকার হয়েছে ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। আর বিভিন্নভাবে অশ্লীল ছবি তুলে ব্লাকমেইল করা হয়েছে ১৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ নারীকে। ১২ দশমিক ২২ শতাংশ নারীকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। আর ৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ নারীকে টেক্সট মেসেজ কিংবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হয়রানি করা হয়েছে। ৪৩ শতাংশ নারী জানিয়েছে, পুরুষরা অবৈধভাবে তাদেরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছে।

তবে এসব ঘটনায় ৫২ শতাংশ নারী আইনের আশ্রয় নেয়নি। সামাজিক বিড়ম্বনা এবং লোকলজ্জার ভয়ে তারা আইনি পদক্ষেপ থেকে বিরত ছিলেন। আর এসবের মধ্যে ৩৫ শতাংশ নারী বিষয়টি নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করেছে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, যৌন হয়রানির শিকার হয়ে এই সময়ে ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ ছাত্রীর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে।

যৌন হয়রানির শিকার ৯৫ শতাংশ নারীই কোনো অভিযোগ করেন না। সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ে তারা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকেন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের শিক্ষক কর্তৃক। তুলনামূলকভাবে কম হয়রানির শিকার হয়েছে ছাত্রের মাধ্যমে। আর কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর চেয়ে নারীরা বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (বস) দ্বারা।

উচ্চ আদালতের এক রায়ে ফতোয়ার নামে শাস্তিদানকে বেআইনি ঘোষণা করা হলেও এখন অবৈধ সালিশ ও ফতোয়া দানের মাধ্যমে নারীদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। গ্রাম্য মাতবর ও ধর্মীয় নেতাদের কেউ কেউ এখনো ফতোয়া প্রদান করা থেকে বিরত হন নি। স্থানীয় ইমামদের ফতোয়া কিংবা মাতবরদের সালিশের মাধ্যমে বছরে গড়ে ৩৫ থেকে ৪৫টি নারী নির্যাতনের ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে এসে থাকে। ২০০০ - ২০১৩ সময়কালে আসক'র হিসাব অনুযায়ী এধরনের ৫০৩টি ঘটনা ঘটেছে। কখনো দোরারা মারা, কখনো একঘরে করা কিংবা স্বামীর দেয়া মৌখিক তালাকের ঘটনায় হিল্লা বিয়ে দেয়া হয়। প্রথা, ধর্মের নামে ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা যখন এ ধরনের শাস্তিদানকে ধর্মীয় দিক থেকে কর্তব্য বলে জায়েজ করার চেষ্টা করেন, তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে এ ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে, যার বেশ কিছু প্রমাণ মেলে নিচের কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে।

২০১৩ সালের ২৯ জানুয়ারী *জনকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মধ্যপাড়ায় প্রেম করে বিয়ে করার একটি ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যান আলিম আল রাজী সালিশ ডাকে। সেই সালিশে স্বামী স্ত্রী উভয়কে ২৫টি বেত্রাঘাত করা হয়। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালের *জনকণ্ঠ* পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক বলাটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় দিনমজুর মোফাজ্জল হোসেনের (৫৫)। তালাক কথাটি গ্রামের মাতবরদের কানে চলে যায়। আর এতেই গ্রাম্য মাতবররা বিধান জারি করেন মোফাজ্জলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাবেয়া খাতুনের (৫০) বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এরপর গ্রাম্য মাতবর, সহিদুল ইসলাম, পেনকেটু, মফিজুর রহমান, মকবুল হোসেন এবং তরিকুল ইসলাম ফতোয়া জারি করেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ এবং কথা বলা যাবে না। স্বামী-স্ত্রী মাতবরদের এ আদেশ মানতে না চাইলে তাদের পৃথক করে দিয়ে বাধ্য করা হয় স্ত্রী রাবেয়াকে হিল্লা বিয়ের

পিঁড়িতে বসতে। অথচ ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী মৌখিক তালাক দিলে তা তালাক বলে কার্যকর হবে না। আইনে তালাকের জন্য সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা হিল্লা বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হযেছে।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালের *প্রথম আলো* পত্রিকার প্রকাশিত অন্য একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, বগুড়ার শাজাহানপুরে স্বামী-স্ত্রী'র ঝগড়ার এক পর্যায়ে রাগান্বিত স্বামী সামাদ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। মাতবরেরা ডেকে তাদের হিল্লা বিয়ের কথা বলে এবং হিল্লা বিয়ে না হওয়ায় তাদের একঘরে করে। সমাজচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণার এক পর্যায়ে তাঁরা গ্রাম ছেড়ে উপজেলা সদরে এসে আশ্রয় নেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ মাতবরেরা সামাদের কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে সামাদের প্রায় ছয় বিঘা জমি অনাবাদী হয়ে যায়।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে *যুগান্তর* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা যায়, রাজাপুর গ্রামের এক গৃহবধূর ঘরে শুক্রবার গভীর রাতে একই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে বিল্লাল হোসেনকে চোর হিসেবে আটক করে বাড়ির লোকজন। আটকের পর সকাল হওয়ার আগেই আবার তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সকালে এ ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে যাওয়ার পর গ্রামের মাতব্বর ভিপি শাহজাহান, আবুল খায়ের, মোবারক হোসেনের নেতৃত্বে সকালে সালিশ বৈঠক বসে। বৈঠকে বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে ওই গৃহবধূর পরকীয়ার সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিযোগ এনে তাকে ৪০টি দোররা মারার সিদ্ধান্ত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালের *ডেইলী স্টার* পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদের জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তালশহরে ১৯৮৮ সালের মৌখিক তালাকের জের ধরে গত ৩ মাস ধরে একটি পরিবারকে এক ঘরে করে রাখা হয়েছে। আশির দশকে আবদুল করিমের সঙ্গে নাজমা বেগমের বিয়ে হয়। নাজমা ২ সন্তানের জন্ম দান করে। ১৯৮৮ সালে স্বামী তাকে মৌখিকভাবে তালাক দেয়। নাজমা সবকিছু মেনে নিয়ে সংসার করতে থাকে। ২০০১ সালে ছেলেদের চাপে এক মাওলানার মাধ্যমে নতুন করে বিয়ে পড়িয়ে ঘর সংসার শুরু করে। এই ভাবে এক যুগ কেটে যায়। স্থানীয় একটি মহল তাদের এই সংসারকে অবৈধ আখ্যা দেয়। গত ৬ মাস ধরে একের পর এক গ্রাম্য সালিশ বসানো হয়। এতে সালিশকারীরা ফতোয়া দেয় তার বিয়ে অবৈধ। শুধু তাই নয় গত ৩ মাস ধরে তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে।

অথচ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী যারা বিচারবহির্ভূত শাস্তি চাপিয়ে দিচ্ছে বা তা কার্যকর করায় সহায়তা করছে, তারা ফৌজদারি কার্যবিধি ও অন্যান্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে দায়ী হবেন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সর্বোচ্চ আদালতের যেমন নির্দেশনা রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রও তৈরি করেছে একাধিক আইন। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কি গ্রাম, কি শহর সব ক্ষেত্রেই নারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে বিধি নিষেধ আরোপ করে যাচ্ছে।

প্রতি বছর বেশ ঘটা করেই নারীর অধিকার তথা মানবাধিকার রক্ষায় পালিত হয়ে আসছে বিভিন্ন দিবস – নারী দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, মানবাধিকার দিবস সহ নানা দিবস। দিবস পালনাকারী বিভিন্ন সংগঠনসমূহ আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলে - 'সফলতার সাথে দিবসটি পালিত হয়েছে' এমন শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু এর ফলে কী নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে? উচ্চ আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও ফতোয়া প্রদান বা বিচারবহির্ভূত রায়ের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান কি বন্ধ হয়েছে। না বন্ধ হয় নি, বরং তা আরও বিস্তৃত হয়েছে, প্রযুক্তিকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার না করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে নারীকে লাঞ্ছিত করতে।

২০১৪ সালে *UN Women* পরিবর্তনের প্রতাশা নিয়ে পালন করেছে বিশ্ব নারী দিবসকে। তবে এ পরিবর্তন হতে হবে মন-মানসিকতার। সচেতন হতে হবে প্রতিটি নাগরিককে, নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। আর আইন ও আদালতের নির্দেশনার ব্যতয় ঘটলে দাবি করতে হবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের। তবেই আইন ও আদালতের নির্দেশনা কাগুজে দলিল হবে থাকবে না, বন্ধ হবে নারীর প্রতি সকল অন্যায়, সহিংসতা। কাটবে আঁধার, নিশ্চিত হবে নারীর সাংবিধানিক ও আইনী অধিকার।

আঁধার অচিরেই কেটে যাবে, এমন কোন স্বপ্ন আমরা দেখতে চাই না। তবে মানুষ ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়ে উঠবে, এমন একটা আশা আমরা পোষণ করতে চাই। বহু শতাব্দী ধরে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার যে প্রভাব আমরা দেখতে পাই, তার সঙ্গে ক্ষমতার যোগ আছে, পুরুষদের নিজেদের আধিপত্য এবং আরাম আয়েশ চিরকালীনভাবে নিরাপদ করার যোগ আছে এবং সেই সূত্রে নারীর প্রচলিত সামাজিক অবস্থান বা দুর্বলতাকে শোষণ করার প্রচলিত রীতি আছে। নারীর প্রতি যে সীমাহীন অত্যাচার চলছে, সংবাদপত্রের পাতায় তার প্রতিবেদন ছেপে কোন বড়, ধরনের সুরাহার হবে না। নারীর ক্ষমতা বাড়াতে হবে, নারীকে ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। পুরুষ তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। তবুও নারীকে তার যোগ্যতা, তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে হবে। বাধা সহ্য করে এগিয়ে যেতে হবে। তবে খবরের কাগজে এই ধরনের নেতিবাচক সংবাদ যেমন আমাদের পীড়িত করে, কষ্ট দেয়, তেমনি এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর হাজারো উল্লাসিত কিশোরীর ছবি দেখে তো আমরা উৎসাহিত বোধ করি। নারী দিবসে এই সব চিত্রকেও যেন আমরা উর্ধে তুলতে পারি।

এ এম রাশিদুজ্জামান খান
উন্নয়নকর্মী

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন
মধ্যম আয়ের দেশ হতে শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রয়োজন

দেশে স্কুলে ভর্তির হার বাড়লেও বাড়ছে না শিক্ষার গুণগত মান। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ সন্তোষজনকভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করে। গণিতের ক্ষেত্রে এ হার ৩৩ শতাংশ। ফলে সব শিশুকে শিক্ষা আওতায় আনা হলেও শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে রয়েছে গুণগত মানে। আর মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে বাংলাদেশের শিক্ষার মানোন্নয়নের বিকল্প নেই। 'উর্বর ভূমিতে বীজ বপন: যে শিক্ষা বাংলাদেশের কাজে লাগবে' শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে 'গণসাক্ষরতা অভিযান' একটি জাতীয় সংলাপের আয়োজন করে। এতে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক জেসকু হেনসেল, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক অমিত ধর, আইনবিদ ড. শাহদীন মালিক প্রমুখ। সংলাপে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন অতিথিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১০ বছরে গণশিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সন্তোষজনক মানে পৌঁছেনি। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিষয়ে মানসম্মত দক্ষতা অর্জন করে মাত্র ৪৪ শতাংশ। আর গণিতে মানসম্মত দক্ষতা অর্জন করে ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করতে পারে না, তারা ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। চূড়ান্তভাবে এসব শিক্ষার্থী অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের নগর ও গ্রামে শিক্ষার মানে অসমতা রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষার মানে এগিয়ে। পিছিয়ে আছে রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

প্রতিবেদনের সারমর্ম তুলে ধরে গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ড. মনজুর আহমেদ বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লিঙ্গ সমতা অর্জন করা গেলেও সারা দেশে এখনো ৫০ লাখ শিশু রয়ে গেছে স্কুলের বাইরে। এর অধিকাংশই নগর ও গ্রামের নিম্ন আয়ের পরিবারের হওয়ায় তারা থেকে যাচ্ছে শিক্ষার বাইরে।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের পরিচালক ইয়োহানেস জাট বলেন, বাংলাদেশের শ্রমবাজারে তরুণদের সংখ্যা বাড়ছে। আগামী ১০ বছরে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা পেতে হলে বাংলাদেশকে তরুণদের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। মান নিশ্চিত হলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে মানসম্মত জনশক্তি কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষার মানোন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এবং উন্নত দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। শিক্ষকদের পাঠদানে অবহেলা ও দেশের সার্বিক দুর্নীতির কারণেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গুণগত মানে পিছিয়ে রয়েছে।

বণিক বার্তা ৪.০৩.২০১৪

উচ্চ শিক্ষায় বিজ্ঞান পড়ছে মাত্র ১১ ভাগ শিক্ষার্থী

দেশে বিজ্ঞান, কারিগরি ও কৃষি শিক্ষায় উচ্চস্তরে মাত্র ১১ ভাগ শিক্ষার্থীর পড়ার সুযোগ রয়েছে। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গত ২০ বছরে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমেছে ১০ ভাগেরও বেশি। সরকার বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষায় জোর দেয়ার কথা বললেও এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান চিত্র কেমন।

৩২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানে ৬৫ ভাগ, বাণিজ্যে ২২ ভাগ এবং বিজ্ঞান, কারিগরি ও কৃষিতে মাত্র ১১ ভাগ শিক্ষার্থীর পড়ার সুযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসন সংখ্যা বৃদ্ধি না করায় শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। ২০১৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ২ লাখ ২৬ হাজার পরীক্ষার্থী বিজ্ঞানে পাস করেছে। কিন্তু আসন সংখ্যা কম থাকায় সব শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ পায়নি। একারণে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যে দেখা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়া জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল বর্ষে ১৬ লাখ ৭৪ হাজার ৩৮৭ জন শিক্ষার্থীর আসন রয়েছে। এর মধ্যে কলা ও মানবিক বিষয়ে পড়ছে ৬ লাখ ২৬ হাজার ৭৮০ জন এবং সামাজিক বিজ্ঞানে ৪ লাখ ৬০ হাজার ২৯৬ জন। এছাড়া বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরি বিষয়ে ১ লাখ ৯১ হাজার ১০১ জন, বাণিজ্যে ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৯২৫ জন ও আইনে ৮ হাজার ২৪৮ জন পড়ছে।

জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ৩২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১ লাখ ৯৭ হাজার ২৭৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কলা ও মানবিকে ২০ দশমিক ১৩ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ১৫ দশমিক ৪৫ ভাগ, বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরী বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতকরা হার ৪৬ দশমিক ৪৭ ভাগ। আর বাণিজ্যে পড়ছে ১৩ দশমিক ১৫ ভাগ শিক্ষার্থী।

এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে ১২ লাখ ৬৮ হাজার ৪৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরি বিষয়ে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৭ দশমিক ৩৬ ভাগ, কলা ও মানবিকে ৩০ দশমিক ৯১ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ৩৩ দশমিক ৮৯ ভাগ ও বাণিজ্যে ২৭ দশমিক ৪০ ভাগ পড়ছে।

উচ্চ শিক্ষায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যোগ্য শিক্ষক না থাকায় অভিভাবকরা তার সন্তানকে বিজ্ঞানে পড়াতে রাজি নন। অভিভাবকরা মনে করেন বিজ্ঞানে পড়তে খরচ বেশি। যার অর্থ তারা যোগাতে পারবেন না।

এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান পড়তে হবে, গবেষণা ও উদ্ভাবন করতে হবে। গবেষণার জন্য বাজেট দরকার। এছাড়া চাকরির ক্ষেত্রও কম থাকায় শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে আগ্রহী হচ্ছে না। তবে বিজ্ঞান না পড়লে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া যাবে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ইত্তেফাক ১২.০৩.২০১৪

ক্ষতিগ্রস্ত ৪৭৫ বিদ্যালয় সংস্কারে অগ্রগতি নেই

টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সংস্কারে অগ্রগতি নেই ভোটের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৭৫ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কে কাজ করবে, কে টেন্ডার নেবে, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাজ করাবে

কি-না তা নিয়ে দ্বিধা-দন্দ্বে পড়েছে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে খোলা আকাশের নিচে মাটিতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। সংস্কারে স্কুল কমিটির সভাপতি এবং অভিভাবকরা তোড়জোড় করলেও কোনো উত্তর মিলছে না। জানা গেছে, ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৪৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্বৃত্তরা পুড়িয়ে দেয়। নির্বাচন শেষ হলেও ভোগান্তিতে পড়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর লাখ লাখ খুদে শিক্ষার্থী। সরকারের উর্ধ্বতন মহলে স্কুল ভবন সংস্কারের বিষয়েও ব্যাপক হৈচৈ পড়ে। শিক্ষাবর্ষ শুরু থেকে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পিডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি খাতে ২ কোটি টাকা সংস্থান আছে। এ টাকা থেকে ১১ টি বিদ্যালয় সংস্কারে ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এগুলোর সংস্কার শেষ পর্যায়ে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল সংস্কারে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসবাব তথা চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চের ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া কাঁচা ঘরের শ্রেণীকক্ষ পুড়ে গেছে, যদিও এ সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারে আমরা তোড়জোড় করছি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, অর্থ মন্ত্রাণালয় থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুতগতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের তদারকি করতে। আমরা খোঁজ রাখছি সংস্কার কাজে অগ্রগতির। জানা গেছে, ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত শুধু রংপুর বিভাগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ৭.০৩.২০১৪

প্রাথমিকে ৭৫% শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভেদে ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না। তার পরও অনেকে ওপরের শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাংলাও ভালোভাবে পড়তে পারে না। গণিত ও ইংরেজির অবস্থা আরও খারাপ। এ কারণে শিশুদের ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল্যায়ন, বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন এবং একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার এ রকম করুণ চিত্র নিয়েই আজ রোববার শুরু হচ্ছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। এবারের সপ্তাহের মূল স্লোগান ধরা হয়েছে 'শিক্ষাই জীবনের মূল, ঝরে পড়া বিরাট ভুল'।

প্রাথমিকের এ দুর্বলতা মাধ্যমিকে গিয়েও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অষ্টম শ্রেণীর অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে (যথাক্রমে ৫৬, ৫৬ ও ৬৫ শতাংশ) নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, গণিতে খারাপ হওয়ার কারণে অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশ্বব্যাপী গবেষণায়ও দেখা গেছে, পনেরো বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সের স্কুল পাস করাদের গণিতের পারদর্শিতার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা খারাপ তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। ঝরে পড়ার পর এক পর্যায়ে তারা অনানুষ্ঠানিক কর্মবাজারে প্রবেশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের পঞ্চম শ্রেণীর মাত্র ২৫ শতাংশ শিশু বাংলায় এবং ৩৩ শতাংশ শিশু গণিতে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। অর্থাৎ এ দুই বিষয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৭ শতাংশ শিশু ভালোভাবে শিখছে না।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি)-এর অধীন গাজীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৬টি বিদ্যালয়ে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' নামে নতুন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি চালুর জন্য একটি ভিত্তিরেখা জরিপ (বেইস লাইন সার্ভে) পরিচালনা করা হয়। তাতে দেখা যায়, ওই সব বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ২৫ ভাগের কম শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে। গণিতের অবস্থাও একই হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রও প্রায় অভিন্ন।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কম্পিউটার কাউন্সিল মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, তিনি তাঁর এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে জানতে পারেন, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে অথচ ইংরেজি বইয়ের নাম বানান করে বলতে পারে না একাধিক শিশু। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, বর্তমানে একেকটি শ্রেণীকক্ষে ৬০-৭০ জন শিশু নিয়ে শিক্ষকেরা মুখস্থনির্ভর বক্তব্য দিয়ে চলে যান। এত করে সব শিশু ভালোভাবে শিখতে পারে না। সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে বাড়তি সুযোগ পেলেও অসচ্ছল পরিবারের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে অনেকেই ঝরে পড়ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, 'আমরা চাই সব শিশু প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করুক। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

প্রথম আলো ৯.০৩.২০১৪

মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা না গেলে উন্নতি অসম্ভব

নারীদের কাছে পৌঁছাতে প্রয়োজন রাজনীতির মূলধারায় নারী নেতৃত্ব। অর্থনীতির মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা না গেলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য চাই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এসব নিশ্চিত করতে পুরুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এই অভিমত দেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনে যৌথভাবে 'বাংলাদেশ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউএসএআইডি। আলোচনার স্লোগান ছিল 'নারীর জয়ে সবার জয়'।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা নারীর ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নিতে পরিবার, রাজনৈতিক দলসহ সমাজের সব ক্ষেত্রে মানসিকতা পরিবর্তনের তাগিদ দেন। এ জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েশিশুকে এগিয়ে নিতে পুরুষের সহায়তা কামনা করা।

সূচনা বক্তব্য দেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের তুণমূল প্রকল্পের পরিচালক কেটি ক্রোকি ও ইউএনডিপির সহকারী আবাসিক পরিচালক শায়লা খান। তাঁরা বলেন, নারী কী করতে পারে বা না পারে তা আর আলোচনার বিষয় নয়। এখন নারীকে ক্ষমতায়িত করে কীভাবে দেশের উন্নয়নের সূচক এগিয়ে নেওয়া যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, রাজনৈতিক দলে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অন্তত ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যের পদ থাকার কথা।

'ভবিষ্যতে দিকনির্দেশনা' পর্বে বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সচিব দীপু মনি।

প্রথম আলো ৬.০৩.২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

গণসাক্ষরতা অভিযান সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক সমিতি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন-এর বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।

গত ১৮-২৫ ফেব্রুয়ারি গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ ব্যাচে 'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন' বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ স্বাগত বক্তব্যে এই কোর্সের উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্সে গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যসহ মোট ৪৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র, সুশাসনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম, শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ-র দায়িত্ব আদর্শ স্কুলের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট রাম চন্দ্র দাস এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের সিনিয়র উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন কোর্স পরিচালনা সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

তাজমুন নাহার

রিভিউ এ্যান্ড রিফ্লেকশন সভা

গত ২৮ থেকে ৩০ মার্চ বগুড়ার রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী (আরডিএ) সম্মেলন কক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে এক 'রিভিউ ও রিফ্লেকশন সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীসহ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী অংশ নেন।

২৯ মার্চ সকাল ৯:৩০ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীত-এর মাধ্যমে সভা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়।

উদ্বোধনী পর্বে সভা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার। সভা প্রধান সভার উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এই সভার মূল উদ্দেশ্য হলো গণসাক্ষরতা অভিযান-এর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং সকল কর্মীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আরো জোরদার করা। সঞ্চালনার দায়িত্ব থাকা গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ সভায় কর্মীদের প্রত্যাশা যাচাইয়ের মাধ্যমে সভার মূল অধিবেশন শুরু করেন।

সভায় গণসাক্ষরতা অভিযানের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প প্রত্যাশা, অঙ্গীকার, সৃষ্টি, দোয়েল এবং সিএসিএফ প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করা হয়। বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ। প্রতিটি উপস্থাপনের শেষে প্রশ্নোত্তর-পর্ব অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষনীয় বিষয় এবং প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে অর্জিত কিছু সাফল্যও উঠে আসে।

কাজের গুণগত মান উন্নয়ন, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন, কাজের ফলে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এবং কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে সভায় ৫টি অগ্রাধিকার বিষয়ে সেশন উপস্থাপন করা হয়। সেশন গুলো ছিল-ডেলিগেশন অফ অথোরিটি, ভ্যালু ফর মানি, রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং, আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের অভিজ্ঞতার আলোকে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ধারণা। প্রতিটিই সেশনই ছিল অংশগ্রহণমূলক এবং প্রাণবন্ত। ভূমিকাভিনয় এবং উদ্দীপক খেলার মাধ্যমে সেশনগুলো পরিচালিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী, পরিচালক তাসনীম আত্হার, উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন।

সবশেষে মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং মূল্যায়ন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক এবং কার্যক্রম সহকারী মনিরা সুলতানা সভা আয়োজনের মুল দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম সন্ধ্যায় অভিযানের কর্মীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন করা হয়।

সাকিবা খাতুন

প্রাক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা: আমাদের করণীয় শীর্ষক সেমিনার

ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ আয়োজনে গত ১৯ মার্চ ইএসডিও-ইটিআরসি

হলরুম, গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও-এ *প্রাক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা: আমাদের করণীয়* শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. গোলাম কিবরিয়া মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. একরামুল হক এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মো. মোর্শেদ আলী খান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও নির্বাহী পর্ষদ-এর চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাবেদ আলী।

উদ্বোধনী অধিবেশনে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে সেমিনারের উদ্দেশ্য ও পটভূমি উপস্থাপন করেন উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক এনামুল হক খান তাপস।

সেমিনারে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগীসহ প্রায় ৮০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

এনামুল হক খান তাপস

আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১

২৪ মার্চ নওজোয়ান, চট্টগ্রাম ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, পটিয়া, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ শীর্ষক আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা।

সভার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নওজোয়ান-এর প্রধান নির্বাহী ইমাম হোসেন চৌধুরী। সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন অভিযান-এর উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান আখন্দ।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর উপর ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনীর অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. আবদুল আউয়াল। তিনি ধারণাপত্রে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের বর্তমান পরিস্থিতি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে আমাদের কি করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন।

সকল পেশা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণে বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে জিডিপি'র ক্ষেত্রে গার্মেন্টস সেক্টর ও প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স-এর ভূমিকা অনেক বেশি। কাজেই এ সেক্টরের শ্রমিকদের দক্ষতা বিবেচনায় রেখে দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও দক্ষতা বাড়াতে না পারলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রভাব পড়বে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে হবে এবং দেশের বাজারের চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে ঢেলে সাজাতে হবে।

মতবিনিময় সভার সভাপতি পটিয়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকেয়া পারভিন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভা আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হলো অদক্ষ জনগোষ্ঠী ও বেকারত্ব। আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিনত করতে পারলে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা এই নীতিমালায় রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে বিদেশে যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক শ্রমিককে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, প্রাইভেট দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট ফোরামের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মিজানুর রহমান আখন্দ

পরিকল্পনা সভা
গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ১০০ কোটির অধিক মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫%) বাস করে বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার কারণে সমাজে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এদের মধ্যে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর একটি বড় অংশ শিক্ষার বাইরে রয়েছে। আবার যারা যুক্ত হয়, কিছুদিন পরে তারাও ঝরে পড়ে। এদের বাদ দিয়ে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। তাই সারা বিশ্বে সুনির্দিষ্ট এ্যাডভোকেসি এবং কৌশলগত জনসমাবেশ-এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বছর শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা (Education and Disability) প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ৪ থেকে ১০ মে ২০১৪ বিশ্বব্যাপী গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ-২০১৪ উদযাপিত হবে।

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪ আয়োজন উপলক্ষে গত ২৪ মার্চ একটি পরিকল্পনা সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইন্টারভিডা বাংলাদেশ-এর সমন্বয়কারী মো. গিয়াসউদ্দিন সরকার। সভায় জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং

শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিসহ প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান এবারের গ্লোবাল অ্যাকশন উইক উপলক্ষে পোস্টার এবং লিফলেট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় পর্যায়ে গ্লোবাল অ্যাকশন উইক উদয়াপনের লক্ষ্যে সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ২৫ মার্চ আরো একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গ্লোবাল অ্যাকশন উইক-২০১৪ উদযাপন করার জন্য খসড়া সমঝোতা স্মারক, ধারণা পত্র, গাইডলাইন (রিপোর্টিং, ফাইন্যান্সিয়াল) উপস্থাপন করা হয়।

উল্লেখ্য এবছর গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী সংগঠনের সাহায্যে সারা দেশে ৭টি বিভাগের ৩০টি জেলায় গ্লোবাল অ্যাকশন উইক উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ফারদানা আলম সোমা

কর্মশালা: শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক 'শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের ফলে একটি স্বার্থক শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে শিক্ষণ আনন্দদায়ক হয় এবং শিখন স্থায়ী হয়। মোট কথা কার্যকর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ ও খুলনা জেলায় মার্চ ২০১৪ মাসে "*শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়*" শীর্ষক ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), সিরাজগঞ্জ এবং আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত কর্মশালাসমূহে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, শিক্ষক- অভিভাবক সমিতি, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, এনজিও, এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ থেকে মোট ১১৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাসমূহে অধিবেশন পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই সুপার, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রমূখ। খুলনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালার সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দীপংকর বিশ্বাস। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোশাররফ হোসনে কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মোশাররফ হোসেন

মতবিনিময় সভা সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট

গণসাক্ষরতা অভিযান বিগত কয়েক বছর ধরে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গণসাক্ষরতা অভিযান বিশ্বাস করে, জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০% অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ এবং তার প্রায় ৫০% মৌলিক শিক্ষায় ব্যয় করার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি বিষয়ে জনমানুষের দাবি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা শীর্ষক ৯টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। উক্ত সভাসমূহে একইসাথে 'EFA ২০১৫ পরবর্তী ভাবনা' নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে ইএফএ ২০১৫ পরবর্তী ভাবনা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ইউনিস্কো বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানকে ইএফএ-এর অগ্রগতি এবং ২০১৫ পরবর্তী ভাবনা বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে মতবিনিময় সভা আয়োজনের অনুরোধ জানানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান "সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক কর্মসূচির সাথে উপর্যুক্ত বিষয়টি নিয়েও মতবিনিময় সভায় আলোচনা করে। রাজশাহী, গাইবান্ধা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা, খুলনা এবং মাদারীপুর জেলায় মতবিনিময় সভাসমূহ আয়োজন করা হয়। সভাসমূহে নয়টি সভায় সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার গর্ভনিং বডির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি, শিক্ষা উন্নয়ন কর্মীসহ প্রায় ৭০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভাসমূহে সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা এবং Education For All-EFA 2015 Report: A Civil Society Perspective, Bangladesh বিষয়ক দুটি উপস্থাপনা পেশ করা হয়। বাজেট বিষয়ক প্রবন্ধটি তৈরি করেন একশন এইড বাংলাদেশ-এর এডুকেশন ম্যানেজার, খোন্দকার লুৎফুল খালেদ। মতবিনিময় সভাগুলোতে সম্পদ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম. হাবিবুর রহমান, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, সেভ দ্য চিলড্রেন, গোলাম মোস্তফা দুলাল, পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অধ্যাপক নাজমুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক শফি আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, সদস্য, শিক্ষানীতি কমিটি।

রেহানা বেগম

মাছে ফরমালিন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন
জনস্বাস্থ্য রক্ষা করুন

মনে রাখবেন ফরমালিনযুক্ত মাছ

কেবল ভোক্তাদের জন্য নয় বিক্রেতাদের জন্যও স্বাস্থ্য হানিকর

মাছের ভেতরে ব্যবহৃত ফরমালিন শরীরে প্রবেশ করার ফলে:

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়
- পরিপাকতন্ত্রে জটিলতা দেখা দেয়
- দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়
- গর্ভাবস্থায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে
- চর্ম, এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, এজমা রোগ দেখা দেয়
- কিডনী ও লিভারের রোগ এমনকি ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে

ফরমালিনযুক্ত মাছ

- চক্ষুগোলক ভিতরের দিকে ঢুকানো এবং ফ্যাকাশে দেখায়
- দেহে স্লাইম/স্বাভাবিক পিচ্ছিলতা থাকে না
- ফুলকা কালচে বর্ণের দেখায়
- দেহ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে
- মাছের দেহে মাছি বসে না
- মাছের স্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায় না
- মাছ সহজে পচে না

ফরমালিনমুক্ত মাছ

- চক্ষু স্বাভাবিক এবং লালচে বর্ণের দেখায়
- দেহে স্লাইম/স্বাভাবিক পিচ্ছিলতা থাকে
- ফুলকা লালচে বর্ণের দেখায়
- দেহ শুষ্ক নয়
- মাছের দেহে মাছি বসে
- মাছের স্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায়
- সময়ের ব্যবধানে মাছ পচে যায়

মাছে ফরমালিনের ব্যবহার মৎস্য আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ
এক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৩৮ চৈত্র ১৪২০ মার্চ ২০১৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

স ম্পা দ ক

এক নদী রক্তের বিনিময়ে যাঁরা আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতাকে রাজনৈতিকভাবে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাঁদের ভুলব না। এমন একটা সরল সহজ বিবৃতির মধ্যে হয়ত সঙ্গত কারণেই এক ধরনের রোমান্টিকতা বা উচ্ছ্বাস থাকে। কিন্তু তার গভীরে আন্তরিক দায়বদ্ধতার অস্তিত্বও আছে। ষাটের দশক জুড়ে দীর্ঘ সংগ্রাম, তারপর প্রায় আক্ষরিক অর্থে এক নদী রক্তের বিনিময়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আবেগতাড়িত করতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেও তো সত্য উচ্চারণের শক্তিটাকে শনাক্ত করা যায়।

ঊনিশ শ' একাত্তর সাল পেরিয়ে এসেছি, সে-ও চার দশকেরও বেশি আগে। এবং স্বাভাবিক কারণেই হয়ত এমন গান আর রচনা করছেন না সমকালের গীতিকারবৃন্দ। আজ যাঁরা গান লিখছেন, তাঁদের স্মৃতিতে বা অভিজ্ঞতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত দিনগুলির কথা হয়ত একই মাত্রায় প্রত্যক্ষ নয়, স্পর্শযোগ্য নয়, জ্বলজ্বলে নয়। আমরা এমন প্রত্যাশার ওপরও খুব জোর দিতে চাই না যে, ১৯৭১ সাল এবং তার সমীপবর্তী সময়ে যে অনুভবে, যে রোদন-বেদনে দেশাত্মবোধক গান লেখা হয়েছিল বা গাওয়া হত, ঠিক অমন ভাষা ও ভাবের গান রচনার রীতি অক্ষুণ্ণই থাকতে হবে।

তবে যা অবশ্যই আশা করতে পারি তা হল, স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস হিসেবে সত্যিই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের মধ্যে, আমাদের অনাগত সকল প্রজন্মের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে যে কথাটি বার বার উচ্চারণ করেন আমাদের বহুসংখ্যক সুবিধাসন্ধানী রাজনীতিবিদ, তারা নিজেরাও হয়ত অনেকে এই চেতনার মর্মার্থ আত্মস্থ করতে পারেন না। খুবই প্রচলিত একটি দ্বন্দ্ব-বিতর্কের বিষয় অনেক সময়ই উত্থাপিত হয়ে থাকে। দেশকে যথার্থই ভালোবাসেন, শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে থাকা এমন অনেক ব্যক্তিই গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক মুক্তি নেহাতই অর্থহীন।

আমাদের মত একটা সমাজ কাঠামোর মধ্যে সব অর্থে শ্রেণীবৈষম্যবিহীন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে, এমন ভাবনাকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু যা আমাদের জরুরি মনোনিবেশ দাবি করে তা হল, সমাজে এক শ্রেণীর নীতিহীন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর বিস্তার, যারা দেশের সম্পদের প্রায় আশি ভাগ ভোগ করছে এবং বিপরীত দিক থেকে দেশের চার-পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অধিকারহীন অবস্থায় থেকে যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটা গভীর অর্থ হল দেশের সব কিছু- রাজনীতি, অর্থনৈতিক পরিসম্পদ, ভৌত সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিতে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা। সামগ্রিক বিচারে আমরা তার আংশিক বাস্তবায়নেও সফল হইনি। স্বাধীনতা দিবসে এই কঠিন সত্যটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং তা প্রতিকারের জন্য সকল নাগরিককেই যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org